بسم الله الرحمن الرحيم

রিসার্চ এন্ড মাসায়েল (RAM 302)

Topic:

গর্ভবতী মহিলার আমল ও গর্ভস্থ সন্তান বা সন্তান জন্ম গ্রহনের পর মারা গেলে পিতা-মাতার ফজিলত কি?

Submitted to: Mufti Abdul Wahid

Course Instructor, RAM 302

RAM & FQH Department

Islamic Online Madrasa (IOM)

Submitted by: Nusrat Jahan

Student, Batch- 201

ID- 20102089

Bachelor in Dawah & Islamic Studies (Alim Preparatory Course)

Islamic Online Madrasa (IOM)

Date: 30/11/2022

إِنَّ الْحَمْدُ للهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا ، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُّضْلِلِ اللهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

নিশ্চয় যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। আমরা তারই প্রশংসা করি, তার কাছে সাহায্য চাই, তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আল্লাহর নিকট আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্টতা ও আমাদের কর্মসমূহের অকল্যাণ থেকে আশ্রয় কামনা করি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দেন, তাকে গোমরাহ করার কেউ নেই। আর যাকে গোমরাহ করেন তাকে হিদায়াত দেওয়ারও কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্যিকার ইলাহ নেই, তিনি একক, তার কোনো শরীক নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। সালাত ও সালাম নাযিল হোক তাঁর ওপর, তাঁর পরিবার-পরিজন ও তার সাহাবীদের ওপর এবং যারা কিয়ামত অবধি ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করেন তাদের ওপর।

সূচীপত্রঃ পৃষ্ঠা

সার সংক্ষেপঃ

একজন নারীর জন্য অনেক বেশি সম্মান আর গর্বের বিষয় হল মাতৃত্ব। আর এই মাতৃত্বের শুরু হয় বিবাহ আর তার পরবর্তী গর্ভধারনের মাধ্যমে। কুরআন এ কারীমে আল্লাহ সুবহানাহুতা'আলা একাধিক বার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে গর্ভধারিণী মায়ের সম্মান। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং মা এবং স্ত্রী জাতির সম্মান কতটুকু তা বুঝিয়ে দিয়েছেন কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে। এ বিষয়ে রাসুল (সঃ) এর অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থের জিহাদ অংশে ৩১৯৪ নম্বর হাদিসে বলা হয়েছে,

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ جَبْرًا، فَلَمَّا دَخَلَ سَمِعَ النِّسَاءَ يَبْكِينَ وَيَقُلْنَ: كُنَّا نَحْسَبُ وَفَاتَكَ قَتْلًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ: «وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ إِلَّا مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِنَّ شُهَدَاءَكُمْ إِذًا لَقَلِيلٌ، الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهَادَةٌ، وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ، وَالْحَرَقُ شَهَادَةٌ، وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ، وَالْمَغْمُومُ - يَعْنِي الْهَدِمَ - شَهَادَةٌ، وَالْمَجْنُونُ شَهَادَةٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ»، قَالَ رَجُلٌ: أَتَبْكِينَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ؟ قَالَ: «دَعْهُنَّ، فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ عَلَيْهِ بَاكِيَةٌ»

আবদুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন জারর (রাঃ) তাঁর পিতার সূত্রে থেকে বর্ণিতঃ

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর পিতা জারর (রাঃ)-কে তার রোগ শয্যায় দেখতে গেলেন। তার নিকট গিয়ে দেখলেন নারীরা কেঁদে কেঁদে বলছে: আমরা মনে করেছিলাম, তুমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করবে। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ না হলে তোমরা কাউকেও শহীদ মনে কর না, এমন হলে তো তোমাদের শহীদের সংখ্যা অতি অল্পই হবে। আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হওয়া শাহাদাত, পেটের পীড়ায় মরাও শাহাদাত, আগুনে পুড়ে মরাও শাহাদাত, পানিতে ডুবে মরাও শাহাদাত, কোন কিছুর নিচে চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করা শাহাদাত, নিউমোনিয়া জাতীয় কঠিন পীড়ায় মৃত্যুবরণও শাহাদাত, যে স্ত্রীলোক গর্ভাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সেও শহীদ। এক ব্যক্তি বললেন: রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এখানে উপবিষ্ট আর তোমরা ক্রন্দন করছো? তিনি বললেন: তাদেরকে কাঁদতে দাও। সে যখন মরে যাবে, তখন যেন তার জন্য কোন ক্রন্দনকারিণী ক্রন্দন না করে। [১]

এই হাদিসে সরাসরি বলা হয়েছে যে গর্ভাবস্থায় মৃত্যুবরণকারী স্ত্রীলোক শহীদের মর্যাদা পাবে। শুধু তাই নয়, গর্ভধারণের শুরু থেকে বাচ্চাকে বুকের দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত পুরো সময়টা একজন মা জিহাদের সমান পরিমান সওয়াব পাবেন বলে আশা করতে পারেন। সুবহানআল্লাহ!

আমরা এই গবেষণা পত্রে গর্ভধারণের গুরুত্ব ও ফযিলত, এ সময়ের গুরুত্বপূর্ণ আমলসমূহ এবং গর্ভস্থ সন্তান বা জন্ম গ্রহনের পর সন্তান মারা গেলে পিতা-মাতার ধৈর্য ধারনের বিপরীতে কি কি পুরস্কার আল্লাহ তা'আলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা আলোচনা করব কুর'আন ও হাদিসের উপর ভিত্তি করে।

ভুমিকাঃ

সন্তান গর্ভে ধারণ করা একজন নারীর জন্য পরম সৌভাগ্যের বিষয়। গর্ভ ধারণ করা খুবই ফজিলতপূর্ণ একটি আমল, যে কারণে রাসুল (সা.) বিখ্যাত মহিলা সাহাবি উম্মে সালামা (রা.)-কে বলেছিলেন, 'তোমাদের কেউ কি এতে খুশি নয় যে, সে যখন স্বামীর পক্ষ থেকে গর্ভবতী হয় এবং স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্টও থাকে তখন (এই গর্ভকালীন) সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সর্বদা রোজা পালনকারী ও সারারাত নফল ইবাদতকারীর মতো সওয়াব পেতে থাকবে। তার যখন প্রসব ব্যথা শুরু হয় তখন তার জন্য নয়ন শীতলকারী কী কী নিয়ামত লুকিয়ে রাখা হয়, তা আসমান জমিনের কোনো অধিবাসীই জানে না। সে যখন সন্তান প্রসব করে তখন তার দুধের প্রতিটি ফোঁটার পরিবর্তে একটি করে নেকি দেওয়া হয়। এ সন্তান যদি কোনো রাতে তাকে জাগিয়ে রাখে (অসুখ ইত্যাদির কারণে বিরক্ত করে মাকে ঘুমুতে না দেয়) তাহলে সে আল্লাহর পথে নিখুঁত সত্তরটি গোলাম আজাদ করার সওয়াব পাবে।' [২]

মায়ের গর্ভে ভ্রূণ অবস্থা থেকেই মায়ের যাবতীয় চাল-চলন ও গতিবিধির একটা বিরাট প্রভাব সন্তানের ওপর পড়ে থাকে। এ সময় যেহেতু মায়ের রক্ত গ্রহণ করে সন্তান বড় হয়। সুতরাং এই রক্তে পাপের ক্রিয়া সংমিশ্রিত থাকলে সন্তানের মাঝেও পাপী মানসিকতার বিস্তার ঘটাতে পারে। সন্তান গর্ভে থাকাবস্থায় মা যদি হারাম খাবার গ্রহণ করেন, হারাম কাজ করেন যেমন পর-পুরুষের দিকে কু-দৃষ্টিতে তাকান, সিনেমা, নাটক, নাচ-গান ইত্যাদি অবলোকন ও উপভোগ করেন, তাহলে সন্তানের মধ্যেও এর কুপ্রভাব পড়তে পারে এবং এতে সন্তান চরিত্রহীন হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়। পক্ষান্তরে এ সময় নেককাজ করলে তার প্রভাবও সন্তানের ওপর পড়ে।

ইসলামী শিক্ষার সঠিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে 'সত্যবাদী মুমিন' 'রক্ষণশীল প্রতিনিধি' এবং 'দৃঢ়-বিশ্বাসী' মানুষ তৈরি করা। আল্লাহর পরিচয় জানা ও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে ইহকালীন ও পরকালিন মুক্তি অর্জন করা। এ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জন করা একমাত্র পরিতৃপ্ত ঈমানী শক্তি দ্বারাই সম্ভব। প্রতিনিধিত্বমূলক দায়িত্বশীলতার মাধ্যমে সামনের দিক এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রত্যয়ী হতে হবে। এছাড়াও সঠিক অনুভূতি, বাস্তবধর্মী কর্ম পদ্ধতি, হৃদয়ের সাহস, আমানত ও বিশ্বাসের দৃঢ়টা এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে আবশ্যিক উপকরণ। কাজের দক্ষতা এবং সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন ছাড়া এ লক্ষ্যে পৌঁছা কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়।

আর সম্ভাবনাময় একজন মানুষ গঠন করতে হলে, এ সকল উন্নত গুণাবলীর বীজ মানব শিশুর মূল উৎস শিশু বয়সেই স্থাপন করতে হবে। এ জন্যই পরিবার এবং পারিবারিক সুসম্পর্কই হচ্ছে শিশুদের ইসলামী শিক্ষা তথা নববী শিক্ষার কারিকুলামের মূল ভিত্তি। কারণ, পরিবারই শিশুর মানসিক ও বৈষয়িক বিকাশের সর্বপ্রথম আশ্রয়স্থল। একটি মানব শিশু তার মানসিক ও বৈষয়িক যে কোনোও ধরনের প্রয়োজন পূরণে অক্ষম অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। তখন একমাত্র পরিবারই তার সকল প্রকার প্রয়োজন পূরণে সহায়তা ও ব্যবস্থা করে তাকে সুন্দরভাবে লালন-পালনের যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। এজন্যই পরিবার গঠন ও পরিবারের সুসম্পর্কই হচ্ছে মানবিক গঠন ও বিকাশের প্রাণকেন্দ্র। যার ওপর ভিত্তি করে মানবিক ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। এজন্যই পবিত্র আল-কুরআন ও রাসূলের বাণী এবং মানবতার মুক্তির ধর্ম ইসলাম পরিবার এবং পরিবারের সুসম্পর্ককে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে এবং ব্যক্তি ও সমাজ গঠনে পরিবারকে প্রথম বীজ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। আমাদেরকে তাই পরিবার এবং পারিবারিক সুসম্পর্ক বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানতে হবে যাতে সঠিকভাবে পরিবার ও পারিবারিক সম্পর্কের মূল্যায়ন করে মুসলিম শিশুদেরকে

যথাযথ তা'লীম-তরবিয়তের ব্যবস্থা করে সঠিকভাবে লালন পালন করা যায়। তাদের থেকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিস্থিতির আগ্রাসনের শিকার, অন্ধবিশ্বাস, ভ্রান্ত-অনুকরণ, বিচ্যুতি এবং চিন্তার স্থবিরতা ইত্যাদি অপসারণ করা যায়। বিশেষ করে বর্তমান চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় মুসলিম জাতিকে যেন হিফাযত করা যায়।

এ সম্পর্কে আল্লাহ আল-কুরআনে বলেন,

﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ٢١﴾ [الروم: ٢١]

"আর তাঁর নিদর্শনা-বলীর মধ্যে একটি নিদর্শন হচ্ছে যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে"। [৩]

গর্ভধারনের কিছু ফজিলতঃ

একজন মহিলা গর্ভধারণ করলে তার পুরো দুনিয়ার জীবনটাই অন্য রকম হয়ে যায় শুধু তা নয়, বরং আসমানেও তার সন্মান বাড়িয়ে দেন স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহুতা'আলা। দীর্ঘ ৯ মাস একজন মাকে বিভিন্ন শারীরিক,মানসিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হয় আর শেষ কয় মাসে তার কষ্ট অবর্ণনীয় পর্যায়ে পৌঁছে। রব্বুল ইযযাহ প্রতিটি কষ্টের বিনিময়ে অতি উত্তম ভাবে প্রতিদান দিবেন এই বিশ্বাস মুমিনাহ নারীদের সাহস, ধৈর্য আর মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দেয়।

নিম্নে গর্ভধারণের কিছু ফজিলত উল্লেখ করা হলঃ

i)শরিয়ার উদ্দেশ্য পূর্ণ করাঃ

গর্ভধারণের মাধ্যমে একজন নারী ইসলামি শরিয়ার উদ্দেশ্য পূরণ করে থাকেন। তিনি গর্ভধারণ ও জন্ম দানের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনেক প্রজন্ম তৈরির সুযোগ করে দিচ্ছেন, যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে। এক কথায় বলা যায়, ইসলাম জারি রাখার কাজ করে যাচ্ছেন নারীরা। তিনি যাদের জন্ম দিবেন, তারা আরও সন্তান জন্ম দিবে এবং এরা সবাই আল্লাহ তা'আলার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে, ইসলামকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।

ii)অশেষ ছওয়াব অর্জনের সুযোগঃ

গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদানের মাধ্যমে মুসলিম নারীরা অশেষ ছওয়াব অর্জনের সুযোগ পাচ্ছেন। আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেনঃ

«مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا»

"কোনো মুসলিম বিপদাপদে পতিত হলে বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহ মোচন করেন। এমন কি শরীরে একটি কাঁটা বিধলেও তার বিনিময়ে গুনাহ মাফ করা হয়"। [৪]

সুবহানআল্লাহ! যে কোন ক্লান্তি, অসুস্থতা, দুশ্চিন্তা, মনবেদনা, কস্ত, উৎকণ্ঠা যাই মুসলিমকে স্পর্শ করুক না কেন, এমনকি যদি একটি কাঁটাও তাকে আঘাত করে, তবে তার বিনিময়ে আল্লাহ তার গোনাহ থেকে কিছু ক্ষমা করবেন।

iii)কষ্টগুলো সৎকাজে রূপান্তর হয়ে যাচ্ছেঃ

গর্ভাবস্থার প্রতিটি কষ্ট আমলনামায় সৎকাজ রূপে লিপিবদ্ধ হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« إِذَا ابْتَلَى اللَّهُ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ قَالَ اللَّهُ : اكْتُبْ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ ، فَإِنْ شَفَاهُ غَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ ، وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ » . (رواه أحمد) .

“যখন আল্লাহ তা‘আলা কোনো মুসলিম বান্দাকে তার শারীরিক দুঃখ-কষ্ট বা রোগ-ব্যাধির দ্বারা পরীক্ষা করেন, তখন আল্লাহ বলেন: তার সৎকাজগুলো লিখ, যে কাজগুলো সে (সুস্থ অবস্থায়) করত; অতঃপর তিনি যদি তাকে রোগমুক্ত করেন, তাহলে তিনি (রহমতের পানি দ্বারা) ধুয়ে মুছে তাকে পবিত্র করে দেন; আর যদি তাকে মৃত্যুর মাধ্যমে উঠিয়ে নেন, তাহলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন এবং তার প্রতি রহম করেন।”[৫] তিনি হাদিসটি হাম্মাদ ইবন সালামা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি সিনান ইবন রবি‘আ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন।

iv)সকল খারাপ আমল মুছে ফেলা হয়ঃ

ইসলামে গর্ভধারণ এত ফজিলত পূর্ণ আমল যে এ সময় প্রতিদিন ১০০০ ভাল আমল গর্ভধারিনীর আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয় আর ১০০০ খারাপ আমল মুছে ফেলা হয়। [১৮৫]

v)ফেরশতারা দুয়া করতে থাকেঃ

গর্ভধারিণী মায়ের জন্য ফেরশতারা পর্যন্ত দুয়া করতে থাকে। প্রতিদিন তার জন্য ফেরেশতারা ইস্তেগফার করতে থাকে। [১৮৫]

vi)শহীদের মর্যাদাঃ

গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদান প্রক্রিয়াকে জিহাদের সমতুল্য ধরা হয়েছে। সুতরাং,এই সময়ে বা এই সময়ের পর নিফাসের ৪০ দিনের মধ্যে কোন জটিলতার কারণে জীবন হারালে, তার জন্য রয়েছে শহীদের মর্যাদা।

vii)ভালকাজের প্রতিদান বহুগুন বেড়ে যায়ঃ

এ সময়কার নামাজ, রোজার সওয়াব বহুগুন বাড়িয়ে দেয়া হয়। গর্ভধারিণী মায়ের ২ রাকাত নামাজ সাধারণ অবস্থার ৮০ রাকাত নামাজের সমতুল্য। এ সময় সারাদিন তার আমলনামায় রোজা রাখার সওয়াব এবং সারা রাত ইবাদত করার সওয়াব লিপিবদ্ধ হয়।

viii)পুরুষের থেকেও উত্তম মর্যাদাঃ

রাসুল (সঃ) মায়ের অবস্থানকে উচ্চতর বলেছেন। গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদান নারীকে পুরুষের থেকেও অধিক মর্যাদাবান করে তুলেছে। তাই তো হাদিসে বাবার আগে মায়ের কথা ৩ বার রাসুল (সঃ) উল্লেখ করেছেন।

ix)জান্নাত মায়ের পায়ের নীচেঃ

গর্ভধারিণী মায়ের আরেক অর্জন তার সন্তানদের জন্য জান্নাতের দরজা হয়ে যাওয়া। মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত।

x)পুরুষের থেকেও বেশি ধৈর্য ও সক্ষমতা অর্জনঃ

এ সময়ে একজন মাকে ১০ জন পুরুষের সমান ধৈর্য ও সক্ষমতা প্রদান করা হয়। সন্তানের জন্য রাত জাগার কারনে তার আমলনামায় ৭০ জন দাস মুক্তির সওয়াব লেখা হয়। প্রতিটা ফোঁটা দুধের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা অফুরন্ত পুরস্কার রেখেছেন। তবে, আল্লাহর রাস্তায় বড় করার দায়িত্ব অবশ্যই বাবা-মা দুজনেরই এবং মা-সন্তানের দেখা শোনার জন্য বাবাও হবেন অনেক সওয়াবের অধিকারী।

সন্তান গ্রহনের গুরুত্ব ও তাৎপর্যঃ

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো পরিবার। পারিবারিক জীবন থেকেই গড়ে উঠে ইসলামী পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থা। এই সমাজ ব্যবস্থার সুস্থতার নির্ণায়ক হচ্ছে কুরআন আর সুন্নাহ। বংশ পরম্পরায় কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে রাখার মাধ্যমে আমরা ইসলামী সমাজের শক্ত ভীত প্রতিষ্ঠিত করতে পারব। ইসলামের ঝাণ্ডা এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্ম বহন করে যাবে। আর এই প্রজন্ম তৈরির জন্য প্রয়োজন অধিক হারে সন্তান গ্রহন। রাসুল (সাঃ) আমাদের স্বয়ং উৎসাহিত করেছেন বেশি বেশি সন্তান গ্রহনের জন্য। তাই সন্তান গ্রহন হচ্ছে সুন্নাহ। রাসুল (সঃ) বলেছেন, বিচার দিবসে তাঁর উম্মাহ্ কত বড় হবে তা দেখে তিনি গর্ববোধ করবেন। সকল নবী-রাসুলদের জাতিসমুহের উপর অধিক সংখ্যক জাতি হবে রাসুল (সঃ) এর উম্মাহ। ইমাম আহমদ, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম নাসাঈ ও ইমাম হাকিম রহ. সকলেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«باب فِي تَزْوِيجِ الأَبْكَارِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ ابْنُ أُخْتِ، مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ مَنْصُورٍ، - يَعْنِي ابْنَ زَاذَانَ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لاَ تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ " لاَ " . ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ " تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ ".

আহমদ ইবন ইবরাহীম (রহঃ) ..... মা'কাল ইবন ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলে, আমি এক সুন্দরী এবং সদ্বংশীয়া রমনীর সন্ধান পেয়েছি, কিন্তু সে কোন সন্তান প্রসব করে না (বন্ধ্যা)। আমি কি তাকে বিবাহ করব? তিনি বলেন, না। অতঃপর সে ব্যক্তি দ্বিতীয়বার এসে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে নিষেধ করেন। পরে তৃতীয়বার সে ব্যক্তি এলে তিনি বলেন, তোমরা এমন স্ত্রীলোকদের বিবাহ করবে, যারা স্বামীদের অধিক মহাব্বাত করে এবং অধিক সন্তান প্রসব করে। কেননা আমি (কিয়ামতের দিন) তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে (পূর্ববর্তী উম্মতের উপর) গর্ব প্রকাশ করব। (৬)

সন্তান গ্রহনের তাৎপর্য এতটাই সুগভীর যে রাসুল (সঃ) বলেছেন,

« لا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا ، فَيَشْتَرِيَهُ ، فَيُعْتِقَهُ » . (رواه مسلم).

"কোনো সন্তানই তার পিতার প্রতিদান আদায় করতে সক্ষম নয়; তবে সে যদি তাকে (পিতাকে) দাস অবস্থায় পেয়ে থাকে এবং ক্রয় করার পর আযাদ করে দেয় (তবে কিছুটা প্রতিদান আদায় হবে)।"[৭] সুবহানআল্লাহ! আমাদের জন্য তাই কত বড় একটা সাদকায়ে জারিয়ার সুযোগ হচ্ছে এই সন্তানেরা। আমাদের মৃত্যুর পর তারাই পারবে আমাদের জন্য দুয়া করতে, ভাল কাজ করতে, সাদাকা করতে। আর এ সকল কাজ আমাদের আখিরাতের আমলনামায় যোগ হতে থাকবে। সেদিক থেকে বিবেচনায় সন্তান গ্রহন ও লালন-পালন করা আমাদের জন্য সবচে বড় বিনিয়োগ। আমরা তাদের উপকারি জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে থাকি। আর তারা তা থেকে আমল করলে, তার সুফলতা পাব আমরা। ইমাম নববী (রঃ) এই প্রক্রিয়াটিকে সকল সন্তানদের জন্য প্রযোজ্য ধরে নিয়েছেন। যেমন- একশ বছর আগে আমাদের পূর্ববর্তী কোন পূর্বপুরুষ হয়ত নামায শিখিয়ে গিয়েছেন। তার দিয়ে যাওয়া এই উপকারি জ্ঞান আমরা এখনো ধরে রেখেছি , তার মানে এই যে, তিনি এক সাদকায়ে জারিয়ার উৎস তৈরি করে রেখে গেছেন, যার ধারক-বাহক আমরা, তার পরবর্তী বংশধর। [১৮১]

এ হচ্ছে ইসলামে পরিবারের গুরুত্ব, একমাত্র পরিবারই হচ্ছে সঠিকভাবে মানব তৈরির কারখানা এবং মানব শিশুর সর্বপ্রথম আশ্রয়স্থল। আর ইসলাম পরিবারকে এ ধরনের গুরুত্ব প্রদান- এটা আশ্চর্যের কোনোও বিষয় নয়। কারণ, মানুষ হচ্ছে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব এবং পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি। অপরদিকে এ সৃষ্টি জগতের প্রাণীকুলের মধ্যে একমাত্র মানব সন্তানের শিশুকাল সবচেয়ে দীর্ঘ সময়। এমনকি এক দশকের চেয়েও বেশি সময় অতিক্রম করতে হয় শিশুকাল/বাল্যকাল পাড়ি দিতে। এ জন্যই শিশুকে তার বাল্যজীবনে মানসিক, শারীরিক আত্মিক তা'লীম-তরবিয়ত, সেবা-যত্ন, পরামর্শ, দিক-নির্দেশনা ইত্যাদি দেওয়ার প্রয়োজন হয়। খলিফা হিসেবে তার দায়িত্ব পালনে উপযুক্ত ও প্রস্তুত করার জন্য। আর এ সকল প্রয়োজন একমাত্র পরিবারই দিয়ে থাকে। সুতরাং মানব শিশুর আত্মিক, শারীরিক, বৈষয়িক বিকাশ এবং সকল প্রকার উন্নতি, অগ্রগতি-অবনতি, ইতিবাচক হোক আর নেতিবাচক হোক সকল ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি।এ সকল কারণে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, কেন ইসলাম পরিবার ও পরিবার গঠন এত বেশি গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিয়েছে এবং পরিবার গঠনকে পৈত্রিক ও মাতৃক সুসম্পর্ক এবং মানুষের ফিৎরাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছে? তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, পরিবারের ভীত মজবুত করা এবং পরিবারের সদস্যদের মাঝে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা। আর এ জন্যই ইসলাম পরিবার গঠন, মানুষের ফিৎরাত, পারিবারিক সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক অধিকার ইত্যাদি সর্ব বিষয়ে যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। [১৮৪]

সন্তান গর্ভে ধারণ ও তার লালন-পালন কতটা কষ্টদায়ক কাজ তা আল্লাহ তা'লা জানেন, যিনি প্রতিটা কষ্টের বিনিময় দিবেন। মুমিন বান্দার পায়ে একটা কাঁটা ফুটলে তার বিনিময়ে গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। একটি খেজুর নিজে না খেয়ে দুই কন্যা সন্তানকে খাওয়ানোর উসিলায় এক মায়ের জান্নাত নিশ্চিত হয়ে গেল, হাদিসে এসেছে। সেক্ষেত্রে, সন্তান গর্ভধারিণী এবং সন্তানের বাবা আল্লাহ তা'লার কাছ থেকে দুনিয়া আর আখিরাতে অশেষ পুরষ্কার আশা করতেই পারেন।

কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত পিতা-মাতার সন্মানঃ

সুরা বাকারা ৮৩ নং আয়াতে মহান আল্লাহ তা'লা বলেছেন,

وَ اِذۡ اَخَذۡنَا مِیۡثَاقَ بَنِیۡۤ اِسۡرَآءِیۡلَ لَا تَعۡبُدُوۡنَ اِلَّا اللّٰهَ ۟ وَ بِالۡوَالِدَیۡنِ اِحۡسَانًا وَّ ذِی الۡقُرۡبٰی وَ الۡیَتٰمٰی وَ الۡمَسٰکِیۡنِ وَ قُوۡلُوۡا لِلنَّاسِ حُسۡنًا وَّ اَقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ وَ اٰتُوا الزَّکٰوۃَ ؕ ثُمَّ تَوَلَّیۡتُمۡ اِلَّا قَلِیۡلًا مِّنۡکُمۡ وَ اَنۡتُمۡ مُّعۡرِضُوۡنَ ﴿۸۳﴾

আর স্মরণ কর, যখন আমি বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করবে না এবং সদাচার করবে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীনদের সাথে। আর মানুষকে উত্তম কথা বল, সালাত কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর। অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে স্বল্প সংখ্যক ছাড়া তোমরা সকলে উপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে নিলে। [৮]

এই আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, একত্ববাদে ঈমান, এবং পিতা-মাতা, আত্মীয় স্বজন, ইয়াতীম বালক-বালিকা ও দীন-দরিদ্রের সেবাযত্ন করা, মানুষের সাথে নম্রভাবে কথাবার্তা বলা, সালাত আদায় করা ও যাকাত দেয়া ইসলামী শরীআতসহ পূর্ববর্তী শরীআতসমূহেও ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে মানুষ সেগুলো ত্যাগ করে।

সুরা বাকারা ২১৫ নং আয়াতে মহান আল্লাহ তা'লা বলেছেন,

یَسۡـَٔلُوۡنَکَ مَا ذَا یُنۡفِقُوۡنَ ۬ؕ قُلۡ مَاۤ اَنۡفَقۡتُمۡ مِّنۡ خَیۡرٍ فَلِلۡوَالِدَیۡنِ وَ الۡاَقۡرَبِیۡنَ وَ الۡیَتٰمٰی وَ الۡمَسٰکِیۡنِ وَ ابۡنِ السَّبِیۡلِ ؕ وَ مَا تَفۡعَلُوۡا مِنۡ خَیۡرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِیۡمٌ ﴿۲۱۵﴾

তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কী ব্যয় করবে? বল, 'তোমরা যে সম্পদ ব্যয় করবে, তা পিতা\-মাতা, আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য। আর যে কোন ভাল কাজ তোমরা কর, নিশ্চয় সে ব্যাপারে আল্লাহ সুপরিজ্ঞাত'। [৯]

অর্থাৎ আমাদের সম্পদ হতে কি পরিমাণ ব্যয় করব এবং কোথায় ব্যয় করব? এ প্রশ্নে দুটি অংশ রয়েছে। একটি হচ্ছে অর্থ-সম্পদের মধ্য থেকে কি বস্তু এবং কত পরিমাণ খরচ করা হবে? দ্বিতীয়টি হচ্ছে এই দানের পাত্র কারা? প্রথম অংশে অর্থাৎ কোথায় ব্যয় করবে সে সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছেঃ আল্লাহর রাস্তায় তোমরা যাই ব্যয় কর তার হকদার হচ্ছে, 'তোমাদের পিতা\-মাতা, নিকট আত্মীয় স্বজন, ইয়াতিম মিসকীন ও মুসাফিরগণ। আর দ্বিতীয় অংশের জবাব অর্থাৎ কি ব্যয় করবে? এ প্রশ্নের উত্তর প্রাসঙ্গিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করে এরশাদ করা হয়েছে, 'তোমরা যেসব কাজ করবে তা আল্লাহ তা'আলা জানেন। বাক্যটিতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্যে কোন

পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি যে, এতটুকু বাধ্যতামূলকভাবেই তোমাদেরকে ব্যয় করতে হবে এবং স্বীয় সামর্থ্যানুযায়ী যা কিছু তোমরা ব্যয় কর, আল্লাহর নিকট এর প্রতিদান পাবে।

আবদুল্লাহ ইবন মাস‘উদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ قَالَ : « الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا » . قُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : « بِرُّ الْوَالِدَيْنِ » , قُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : « الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » . (متفق عليه) .

“আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম: আল্লাহ তা‘আলার নিকট কোন আমল সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয়? জবাবে তিনি বললেন: সময় মত সালাত আদায় করা। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম: তারপর কোনটি? তিনি বললেন: পিতা-মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করা। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম: তারপর কোনটি? তিনি বললেন: আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।”[১০] এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিহাদে অংশগ্রহণের ব্যাপারে অনুমতি প্রার্থনা করল, তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করে বললেন:

« أَحَيٌّ وَالِدَاكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : « فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ » . (متفق عليه).

“তোমার পিতামাতা জীবিত আছে কি? সে বলল: হ্যাঁ, তিনি বললেন: তুমি তাঁদের নিকট অবস্থান কর এবং সাধ্যমত তাঁদের সেবা কর।”[১১] আর আনসারদের মধ্য থেকে একজন এসে বললেন:

يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هَلْ بَقِيَ عَلَيَّ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ بَعْدَ مَوْتِهِمَا أَبَرُّهُمَا بِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، خِصَالٌ أَرْبَعَةٌ : « الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا ، وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا ، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا ، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا ، فَهُوَ الَّذِي بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ بِرِّهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا » . (رواه أبو داود و أحمد).

“হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম! পিতামাতার মৃত্যুর পরও তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করার দায়িত্ব আমার উপর অবশিষ্ট থাকবে কি এবং তা আমি কিভাবে করব? তিনি বললেন: হ্যাঁ, চারটি কাজ: তাঁদের জন্য দো‘য়া করা, তাঁদের গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাঁদের করা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা এবং তাঁদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা; আর তাঁদের এমন সব আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা, যাদের সাথে তোমার আত্মীয়তার সম্পর্ক শুধু তাদেরই কারণে। সুতরাং এটাই হল তোমার উপর তাদের মৃত্যুর পরে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার অবশিষ্ট দায়িত্ব।”[১২] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন:

« إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ » . (رواه مسلم).

“কোনো ব্যক্তির পক্ষে সৎকাজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় সৎকাজ হল পিতার মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদ্ব্যবহার করা।”[১৩]

আল্লাহ আরও বলেন,

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلٗا كَرِيمٗا ٢٣ وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا ٢٤﴾ [الاسراء: ٢٣، ٢٤]

“তোমার রব আদেশ করেছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমাদের জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে উহ শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বল তাদেরকে শিষ্টাচার-পূর্ণ কথা। তাদের সামনে ভালোবাসার সাথে নম্র-ভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল: হে রব তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন পালন করেছেন”। [১৪]

মুসলিম ব্যক্তি তার উপর পিতামাতার অধিকারের ব্যাপারে বিশ্বাস করে, আরও বিশ্বাস করে তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার, তাঁদের আনুগত্য ও তাঁদের প্রতি ইহসান করার আবশ্যকতার প্রশ্নে; এটা শুধু এ জন্য নয় যে, তাঁরা তার অস্তিত্ব ও জন্মের উপলক্ষ, অথবা তাঁরা তার জন্য এমন সুন্দর সুন্দর ও ভালো ভালো অবদান রেখেছেন, যা তাকে প্রতিদান স্বরূপ তাঁদের সাথে সেরূপ উত্তম আচরণ করতে বাধ্য করে, বরং তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করার আবশ্যকতার অন্যতম কারণ হল- আল্লাহ তা‘আলা তাঁদের আনুগত্য করাকে ওয়াজিব (আবশ্যক) করে দিয়েছেন এবং সন্তানের উপর পিতামাতার আনুগত্য করা ও তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করার বিষয়টিকে তিনি ফরজ করে দিয়েছেন, এমনকি তিনি বান্দা কর্তৃক একমাত্র তাঁর ইবাদত করার আবশ্যকীয় অধিকারের সাথে এ বিষয়টিকে সংযুক্ত করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ حَمَلَتۡهُ أُمُّهُۥ وَهۡنًا عَلَىٰ وَهۡنٖ وَفِصَٰلُهُۥ فِي عَامَيۡنِ أَنِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيۡكَ إِلَيَّ ٱلۡمَصِيرُ ١٤ ﴾ [لقمان: ١٤]

“আর আমরা মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে, আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু’বছরে। কাজেই আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। ফিরে আসা তো আমারই কাছে।”[১৫] আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক প্রশ্নকারী ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যে প্রশ্নাকারে বলেন:

« مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِى ؟ قَالَ : « أُمُّكَ » . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : « ثُمَّ أُمُّكَ » . قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : « ثُمَّ أُمُّكَ » . قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : « ثُمَّ أَبُوكَ » . (متفق عليه).

“আমার কাছে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার কে? তিনি বললেন: তোমার মা। লোকটি জিজ্ঞাসা করল: তারপর কে? তিনি বললেন: তারপর তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল: তারপর কে? তিনি বললেন: তারপর তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল: তারপর কে? তিনি বললেন: তারপর তোমার পিতা।”[১৬] নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন:

« إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ ، وَمَنْعَ وَهَاتِ ، وَكَرِهَ لَكُمْ : قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ » . (متفق عليه).

“আল্লাহ তা’আলা তোমাদের উপর হারাম করেছেন পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দেওয়া এবং কারও প্রাপ্য আটক করে অন্যায়ভাবে কোন কিছু নেওয়াকে; আর তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দনীয় করেছেন: অনর্থক বাক্য ব্যয়, অতিরিক্ত প্রশ্ন করা ও সম্পদ বিনষ্ট করাকে।”[১৭]

হাদিসে এসেছে,

بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا}

حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ.

ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, (কারো প্রতি তার) পিতা সন্তুষ্ট থাকলে প্রভুও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন এবং তার পিতা অসন্তুষ্ট থাকলে প্রভুও অসন্তুষ্ট থাকেন। [১৮]

بَابُ بِرِّ وَالِدَيْهِ وَإِنْ ظَلَمَا

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الْقَيْسِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ لَهُ وَالِدَانِ مُسْلِمَانِ يُصْبِحُ إِلَيْهِمَا مُحْتَسِبًا، إِلاَّ فَتْحَ لَهُ اللَّهُ بَابَيْنِ يَعْنِي: مِنَ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدٌ، وَإِنْ أَغْضَبَ أَحَدَهُمَا لَمْ يَرْضَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ، قِيلَ: وَإِنْ ظَلَمَاهُ؟ قَالَ: وَإِنْ ظَلَمَاهُ.

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে কোন মুসলিমের মুসলিম পিতা-মাতা জীবিত থাকলে এবং সে ভোরবেলা সওয়াবের আশায় তাদের খোঁজ-খবর নিলে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য বেহেশতের দু'টি দরজা খুলে দেন এবং তাদের একজন থাকলে একটি দরজা। সে তাদের কোন একজনকে অসন্তুষ্ট করলে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাকে সন্তুষ্ট না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হন না। বলা হলো, তারা তার উপর যুলুম করে থাকলে? তিনি বলেন, তারা তার উপর যুলুম করলেও [১৯]।

بَابُ جَزَاءِ الْوَالِدَيْنِ

حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ وَرَجُلٌ يَمَانِيٌّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، حَمَلَ أُمَّهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، يَقُولُ:

إِنِّي لَهَا بَعِيرُهَا الْمُذَلَّلُ إِنْ أُذْعِرَتْ رِكَابُهَا لَمْ أُذْعَرِ

ثُمَّ قَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ أَتُرَانِي جَزَيْتُهَا؟ قَالَ: لاَ، وَلاَ بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ طَافَ ابْنُ عُمَرَ، فَأَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: يَا ابْنَ أَبِي مُوسَى، إِنَّ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ تُكَفِّرَانِ مَا أَمَامَهُمَا.

আবু বুরদা (রহঃ) বলেন, তিনি ইবনে উমার (রাঃ)-এর সাথে ছিলেন। ইয়ামনের এক ব্যক্তি তার মাকে তার পিঠে বহন করে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছিল আর বলছিল, "আমি তার জন্য তার অনুগত উটতুল্য ও আমি তার পাদানিতে আঘাতপ্রাপ্ত হলেও নিরুদ্বেগে তা সহ্য করি"। অতঃপর সে ইবনে উমার (রাঃ)-কে বললো, আমি কি আমার মাতার প্রতিদান দিতে পেরেছি বলে আপনি মনে করেন? তিনি বলেন, না, তার একটি দীর্ঘশ্বাসের প্রতিদানও হয়নি। অতঃপর ইবনে উমার (রাঃ) তাওয়াফ করলেন। তিনি মাকামে ইবরাহীমে পৌঁছে দুই রাকআত নামায পড়ার পর বলেন, হে আবু মূসার পুত্র প্রতি দুই রাকআত নামায পূর্ববর্তী পাপের কাফফারা। [২০]

بَابُ جَزَاءِ الْوَالِدَيْنِ

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ يَبْكِيَانِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِمَا، وَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا.

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, হিজরতের উদ্দেশ্যে বায়আত হওয়ার জন্য এক ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে কান্নারত অবস্থায় ত্যাগ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হলো। তিনি বলেনঃ তুমি তাদের নিকট ফিরে যাও এবং তাদেরকে যেমন কাঁদিয়ে এসেছে তেমনি তাদের মুখে গিয়ে হাসি ফুটাও। [২১]

بَابُ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ زَادَ اللَّهُ فِي عُمْرِهِ

حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ طُوبَى لَهُ، زَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي عُمْرِهِ.

মুআয (রহঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি নিজ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করলো তার জন্য শুভ সংবাদ। আল্লাহ তার আয়ুস্কাল বৃদ্ধি করেন। [২২]

بَابُ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: رَغِمَ أَنْفُهُ، رَغِمَ أَنْفُهُ، رَغِمَ أَنْفُهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ؟ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبْرِ، أَوْ أَحَدَهُمَا، فَدَخَلَ النَّارَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তার নাক ধুলিমলিন হোক! তার নাক ধুলিমলিন হোক!! তার নাক ধুলিমলিন হোক!!! সাহাবাগণ বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! কার নাক? তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বা তাদের একজনকে তাদের বৃদ্ধাবস্থায় পেলো অথচ সে দোযখে গেলো। [২৩]

সুসন্তান তৈরির প্রস্তুতিঃ প্রাক-বিবাহ ও গর্ভকালীন সময়

সুসন্তান গড়ে তোলার প্রথম প্রস্তুতি একজন ভাল, দীনদার জীবন সঙ্গী/ সঙ্গিনীর জন্য আল্লাহ তা'লার কাছে দুয়া করা। পুরুষ বিয়ের জন্য এমন এক মহিলাকে পছন্দ করবে যে কুরআন ভালবাসে, কুরআন তিলাওয়াত করতে পছন্দ করে। একই কথা মহিলাদের জন্য ও প্রযোজ্য। বাবা-মা যদি নিজেরা নেককার না হয়ে, কুরআনকে না ভালবেসে, বাচ্চাকে নেককার, দ্বীনদার, কুরআনের হাফেজ হিসেবে গড়ে তুলতে চান, তাহলে তা হবে নিতান্তই মুনাফেকি কাজ। তাই, প্রত্যেক তাকওয়াবান নারী পুরুষের উচিত, মহান আল্লাহ তা'আলার আমানত আব্দুল্লাহ-আমাতুল্লাহদের বাবা-মা হবার আগে নিজেদের প্রকৃত আব্দুল্লাহ এবং আমাতুল্লাহ হয়ে ওঠা। সন্তানদের চোখ এবং মন ভিডিও ক্যামেরা থেকেও বেশি শক্তিশালী। তারা তাই তাদের বাবা-মাকে যেমনটি দেখে, তেমনি হবার চেষ্টা করে।

একজন মা সন্তানের জীবনে কুরআনের প্রতি ভালবাসা জন্মানোর ক্ষেত্রে বিশাল ভুমিকা রাখতে পারে। মেডিকেল রিসার্চে দেখা গেছে যে, গর্ভকালীন সময়ে কুরআন পাঠ করলে পরবর্তীতে বাচ্চারা কুরআন শুনতে ও পড়তে অভ্যস্থ হয়ে যায়। সার্বিয়ান যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ৭০,০০০ গর্ভবতী মায়েদের উপর একটি বড় মেডিক্যাল গবেষণা চালানো হয়, আর তাতে দেখা গেছে মায়েরা গর্ভকালীন অবস্থায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও অস্থির থাকার ফলে পরবর্তীতে বাচ্চারাও অস্থির ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত স্বভাবের হয়ে পরে। জন্মের পর পর তাদের আচার ব্যাবহার এবং হার্টবিট মনিটর করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। অতএব, মা যত অস্থির থাকবেন, বাচ্চাও তত অস্থির হবে এবং মা যত শান্ত হবে, বাচ্চাও তাই হবে। এজন্য গবেষণায় এসেছে, বাচ্চার শিক্ষাদান প্রক্রিয়া শুরু হয় গর্ভকালীন সময় থেকে। আর এ সময় কুরআন

পড়ার গুরুত্ব অনেক। এক লেকচারে শেখ তৌফিক চৌধুরী বলেছেন, কুরআন মুখস্ত করলে ছোট বাচ্চাদের মধ্যে বাসীরা, হিকমা, নূর তৈরি হয়। যেসব মায়েরা চান তাদের সন্তান হাফেজ এ কুরআন হবে, গর্ভাবস্থা থেকেই বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করে যেতে হবে যাতে করে বাচ্চার হাড় – গোস্তের সাথে কুরআন মিশে যায়।

সালাফদের সন্তানেরা অতি অল্প বয়সে কুরআন ও হাদিস মুখস্ত করে ফেলতেন। তার কারন ছিল তাদের মায়েরা, যারা সর্বক্ষণ কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকতেন। আর এজন্য আমরা বলতে পারি যে, সন্তানদের সুশিক্ষা দেয়ার সুবর্ণ সুযোগ শুরু হয় গর্ভকালীন সময় থেকেই। ইমাম বুখারি (রঃ) এর মা গর্ভাবস্থায় প্রতি ৩ দিনে একবার করে কুরআন খতম দিতেন। ইমাম বুখারি (র) মাত্র ৭ বছর বয়সে কুরআন মুখস্ত সম্পন্ন করেছেন। কয়েক বছর পর তিনি আল্লাহ তা'লার ইচ্ছায় দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেন। তাঁর মা তাঁকে কুরআন পরে শুনাতেন, হাদিস শুনাতেন আর আল্লাহ পাকের কাছে দুয়া করতেন যাতে বুখারি (রঃ) দৃষ্টি শক্তি ফিরে পান। আলহামদুলিল্লাহ ১৬/১৭ বছর বয়সের দিকে তিনি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পান এবং স্বপ্ন যোগে জানতে পারেন, তাঁর মায়ের দুয়ার কারনেই তাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি হাদিসের কিতাব লিখেন এবং তিনি বলেন, মার কারনেই এত হাদিস মুখস্ত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। [২৪]

সুরা কাহাফে আমরা দেখতে পাই, খিজির (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে নেককার বাবা-মার ইয়াতীম সন্তানদের ধন-সম্পদ হেফাজতের জন্য একটি হেলে পড়া দেয়াল ঠিক করে দিলেন কোনোরকম পারিশ্রমিক ছাড়া।

وَ اَمَّا الۡجِدَارُ فَکَانَ لِغُلٰمَیۡنِ یَتِیۡمَیۡنِ فِی الۡمَدِیۡنَۃِ وَ کَانَ تَحۡتَهٗ کَنۡزٌ لَّهُمَا وَ کَانَ اَبُوۡهُمَا صَالِحًا ۚ فَاَرَادَ رَبُّکَ اَنۡ یَّبۡلُغَاۤ اَشُدَّهُمَا وَ یَسۡتَخۡرِجَا کَنۡزَهُمَا ٭ۖ رَحۡمَۃً مِّنۡ رَّبِّکَ ۚ وَ مَا فَعَلۡتُهٗ عَنۡ اَمۡرِیۡ ؕ ذٰلِکَ تَاۡوِیۡلُ مَا لَمۡ تَسۡطِعۡ عَّلَیۡهِ صَبۡرًا ﴿۸۲﴾

'আর প্রাচীরটির বিষয় হল, তা ছিল শহরের দু'জন ইয়াতীম বালকের এবং তার নিচে ছিল তাদের গুপ্তধন। আর তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। তাই আপনার রব চাইলেন যে, তারা দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে তাদের গুপ্তধন বের করে নেবে। এ সবই আপনার রবের রহমত স্বরূপ। আমি নিজ থেকে তা করিনি। এ হলো সে বিষয়ের ব্যাখ্যা, যে সম্পর্কে আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেননি। [২৫]

সুতরাং নেককার বাবা-মার সন্তানদের হেফাজতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ সুবহানআহুতা'লার।

নেককার সন্তানের নেককার বাবা-মা হবার লক্ষ্যে, বিয়ের পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবশ্যই আল্লাহ পাকের সাহায্য চাইতে হবে। দুয়া এবং ইস্তেখারার সলাত আদায়কে জীবনের অংশ করে ফেলতে হবে। বৈবাহিক সম্পর্ক সুন্দর করার জন্য প্রয়োজনীয় পড়া-শুনা করে যেতে হবে, বাবা-মা হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য জেনে নিতে হবে। বিয়ের পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ হাদিস জানা থাকা জরুরী। যেমনঃ

ইমাম মুসলিম রহ. আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করেন:

«تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»

"চারটি বৈশিষ্ট্যের কারণে মেয়েদেরকে বিবাহ করা হয়। (১) তার ধন-সম্পদের কারণে, (২) বংশ মর্যাদার কারণে, (৩) শারীরিক সৌন্দর্যের কারণে এবং (৪) তার দীনদারীর কারণে। অতএব, তুমি ধার্মিকতাকে প্রাধান্য দাও। তোমার দু'হাত ধূলি ধূসরিত (তথা উত্তম) হোক। [২৬]

ইমাম তিরমিযী রহ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ»

"যখন তোমাদের নিকট এমন কোনোও দীনদার, আমানতদার পাত্র বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে যার দীনদারী এবং চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট থাক, তাহলে তার সাথে তোমরা বিবাহ দিয়ে দাও। যদি তোমরা এমতাবস্থায় বিয়ে না দাও তাহলে জমিনে বড় ধরনের ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি হতে পারে"। [২৭]

বিবাহের পর সুসন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দুয়া করতে হবে। সেই সঙ্গে নিম্মের এই হাদিসটি আমল করতে হবে।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি তোমাদের কেউ স্ত্রী সহবাসের ইচ্ছা করে, তখন এই দোআ পড়ে,

বিসমিল্লা-হ, আল্লা-হুম্মা জান্নিবনাশ শাইত্বা-না অজান্নিবিশ শায়ত্বা-না মা রাযাক্বতানা। অর্থাৎ আমি আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি, হে আল্লাহ! তুমি শয়তানকে আমাদের নিকট থেকে দূরে রাখ এবং আমাদেরকে যে (সন্তান) দান করবে তার থেকেও শয়তানকে দূরে রাখ।

তাহলে ওদের ভাগ্যে সন্তান এলে, শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। [২৮]

গর্ভধারণ নিয়ে কুরআনে বর্ণিত আয়াতঃ

i. আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে সুরা হাজ্জে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ۖ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (২২ঃ৫)

হে মানবকূল! যদি ক্বিয়ামত দিবসে জীবিত হওয়া সম্বন্ধে তোমাদের কোন সংশয় থাকে, তবে এ কথা গভীরভাবে চিন্তা করো যে, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, অতঃপর জলবিন্দু থেকে, এরপর রক্তের জমাট থেকে; অতঃপর মাংসপিণ্ড থেকে, গঠিত ও অগঠিত আকৃতি, যাতে আমি তোমাদের জন্য আমার নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করে দিই এবং আমি স্থির রাখি মাতৃগর্ভে যাকে ইচ্ছা, একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত, অতঃপর তোমাদেরকে বের করি শিশুরূপে; অতঃপর এ জন্য যে, তোমরা আপন যৌবনে উপনীত হবে এবং তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্বেই মরে যায়, আর কাউকে

সর্বাপেক্ষা হীনতম বয়সে নিয়ে যাওয়া হয়, যাতে জানার পর কিছুই না জানে। এবং তুমি যমীনকে দেখছো বিশুষ্ক, অতঃপর যখন আমি সেটার উপর বারি বর্ষণ করেছি তখন তা তরুতাজা হয়ে গেলো ও স্ফীত হয়ে এলো এবং প্রত্যেক প্রকার শোভাময় জোড়া উদগত করে আনলো। [২৯]

সুরা হাজ্জের এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহুতা'আলা আমাদের প্রথমবারের সৃষ্টির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। তোমরা তোমাদের মূল সম্পর্কে একটু চিন্তা করে দেখো তো! আমি তোমাদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি অর্থাৎ তোমাদের আদি পিতা হযরত আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করেছি মাটি দ্বারা। তোমরা হলে তারই বংশধর। অতঃপর তোমাদের সকলকে আমি তুচ্ছ পানির ফোঁটার মাধ্যমে সৃষ্টি করেছি। প্রথমে ওটা রক্ত পিণ্ডের রূপ ধারণ করে। তারপর ওটা মাংস পিণ্ড হয়। চল্লিশ দিন পর্যন্ত তো ঐ শুক্র নিজের আকারেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরপর আল্লাহর হুকুমে ওটা রক্ত পিণ্ড হয়। আরো চল্লিশ দিন পরে ওটা একটা মাংস খণ্ডের রূপ ধারণ করে। তখনও ওকে কোন আকার বা রূপ দেয়া হয় না। অতঃপর মহান আল্লাহ ওকে রূপ দান করেন। তাতে তিনি মাথা, হাত, বুক,পেত, উরু, পা এবং সমস্ত অঙ্গ গঠন করেন। কখনও কখনও এর পূর্বেই বাচ্চা পরে যায়। কখনও আবার ঐ বাচ্চা পেটের মধ্যে স্থিতিশীল হয়। যখন ওই পিণ্ডের উপর চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয় তখন আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন তিনি ওটাকে ঠিকঠাক করে রূহ ফুঁকে দেন এবং আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী সুশ্রী, কুশ্রী, পুরুষ, স্ত্রী বানিয়ে দেন। আর রিযিক, আজল, ভাল ও মন্দ তখনই লিখে দেন। [৩০]

হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রসুলুল্লাহ (সাঃ) যিনি সত্যবাদী ও সত্যায়িত, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, " তোমাদের সৃষ্টি (সুত্র) চল্লিশ রাত (দিন) পর্যন্ত তোমাদের মায়ের পেটে জমা হয়। অতঃপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত রক্ত পিণ্ডের আকারে থাকে। তারপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত মাংস পিণ্ডের আকারে অবস্থান করে। এরপর একজন ফেরেশতাকে চারটি জিনিস লিখে দেয়ার জন্য পাঠানো হয়। তা হোল রিজিক, আমল, আজল (মৃত্যু) এবং সৌভাগ্যবান বা হতভাগ্য হওয়া। তারপর তাতে রূহ ফুঁকে দেয়া হয়"। এ হাদিসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। [৩১]

হযরত আলকামা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ "শুক্র গর্ভাশয়ে পড়া মাত্রই ফেরেশতা জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! এটা সৃষ্টি হবে কি হবেনা?" উত্তরে অস্বীকৃতি জানানো হলে ঐ শুক্র গর্ভাশয়ে জমাই হয় না। রক্তের আকারে গর্ভাশয় হতে ওটা বেরিয়ে যায়। আর যদি ওটা সৃষ্ট হওয়ার নির্দেশ হয় তবে ফেরেশতা জিজ্ঞেস করেনঃ "ছেলে হবে না মেয়ে হবে? সৎ হবে না অসৎ হবে? এর আয়ুস্কাল কত? এর ক্রিয়া কি? এর মৃত্যু কোথায় হবে?" তারপর শুক্রকে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "তোমার প্রতিপালক কে?" সে উত্তর দেয়ঃ "আল্লাহ!" আবার জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "তোমার রিজিক দাতা কে?" উত্তরে সে বলেঃ "আল্লাহ!" অতঃপর ফেরেশতাকে বলা হয়ঃ "তুমি (মূল) কিতাবের কাছে যাও। সেখানে তুমি এই শুক্রের সমস্ত তথ্য পেয়ে যাবে।" এরপর সে সৃষ্ট হয়, তকদীরে লিখিত জীবন যাপন করে, লিখিত রিজিক পেয়ে থাকে, নির্ধারিত জায়গায় চলাফেরা করে, তারপর মৃত্যু আসে এবং তকদীরে লিখিত জায়গায় সমাধিস্থ হয়।

একটি শিশু জন্মগ্রহনের পর তার কোন জ্ঞান এবং বোধশক্তি থাকেনা। তারপর আল্লাহ পাক তাকে বড় করতে থাকেন এবং পিতা-মাতার অন্তরে তার প্রতি দয়া ও মমতা দিয়ে দেন। তারা সব সময় তারই চিন্তায় নিমগ্ন থাকে। বহু কষ্ট সহ্য করে তারা তাকে লালন পালন করে।

হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা:) হতে বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ‘‘শিশু যে পর্যন্ত যৌবনে পদার্পণ না করে সে পর্যন্ত তার সৎ কার্যাবলী তার পিতা-মাতার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয়। আর তার দুষ্কার্যবলী তার নিজের আমল নামায় লিখা হয়না এবং তার পিতা-মাতার আমলনামায়ও নয়। এই হাদিসটির কিয়দংশ এখানে উল্লেখ করা হল। সম্পূর্ণ হাদিসটি খুবই গারীব বা দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রঃ) এটা স্বীয় মুসনাদে আনয়ন করেছেন। [৩১]

এর অর্থ হচ্ছে মানুষ নামের প্রজাতির সূচনা হয়েছে আদম আলাইহিস সালাম থেকে। তাকে সরাসরি মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং তারপর পরবর্তী পর্যায়ে শুক্র থেকেই মানব বংশের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছেঃ ‘‘মানুষের সৃষ্টি শুরু করেন মাটি থেকে তারপর তার বংশ-ধারা চালান একটি নির্যাস থেকে যা বের হয় তুচ্ছ পানির আকারে।’’ [৩২]

নুতফা শব্দের অর্থ শুক্র বা বীর্য। সাধারণত: নুতফা বলা হয়, অল্প পানিকে। [৩৩] মাটি থেকে আদম সৃষ্টির পর তার বংশধারা জারি রাখা হয়েছে পানির মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ‘‘আমরা তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির উপাদান থেকে’’ [৩৪] অন্য আয়াতে বলেন, ‘‘তারপর তিনি তার বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হতে’’ [৩৫]

আলাকা শব্দের অর্থ শক্ত রক্ত, ঘন তাজা রক্ত। বা প্রচণ্ড লাল বর্ণ [৩৬] মানব সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ে যখন শুক্রটি মহিলার গর্ভাশয়ে স্থির হয়ে যায়, তখন সেটা চল্লিশ দিন এ অবস্থায় থাকে। এর সাথে যা জমা হবার তা জমা হয়। তারপর সেটি একটি পর্যায়ে আল্লাহর হুকুমে লাল তাজা রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়। এভাবে সেটি চল্লিশ দিন অতিবাহিত করে। তারপর সেটি পরিবর্তিত হয়ে একখণ্ড গোস্তের টুকরোতে পরিণত হয়ে যায়। তখন তাতে কোন রূপ বা সূরত থাকে না। তারপর সেটি বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। তখন তা থেকে মাথা, দু’হাত, বুক, পেট, দুই রান, দুই পা এবং বাকী অংগ-প্রত্যঙ্গসমূহ। কখনও কখনও সেটি সূরত গ্রহণ করার আগেই গর্ভপাত ঘটে যায়, আবার কখনও পূর্ণ অবয়ব ঘটনের পর সেটির গর্ভপাত হয়ে যায়। [৩০]

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, বীর্য যখন কয়েক স্তর অতিক্রম করে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়, তখন মানব সৃষ্টির কাজে আদিষ্ট ফিরিশতা আল্লাহ তা'আলাকে জিজ্ঞেস করেঃ يَا رَبِّ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ অর্থাৎ এই মাংসপিণ্ড দ্বারা মানব সৃষ্টি আপনার কাছে অবধারিত কি না? যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তরে বলা হয় (وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ) তবে গর্ভাশয়ে সেই মাংসপিণ্ডকে পাত করে দেয়া হয় এবং তা সৃষ্টির অন্যান্য স্তর অতিক্রম করে না। পক্ষান্তরে যদি জবাবে (مُخَلَّقَةٍ) বলা হয়, তবে ফিরিশতা জিজ্ঞেস করেঃ ছেলে না মেয়ে, হতভাগা না ভাগ্যবান, বয়স কত, কি কর্ম করবে এবং কোথায় মৃত্যুবরণ করবে? এসব প্রশ্নের জবাব তখনই ফিরিশতাকে বলে দেয়া হয়। [৩৭]

উল্লেখিত শব্দদ্বয়ের তাফসীর থেকে এই জানা গেল যে, যে বীর্য দ্বারা মানবসৃষ্টি অবধারিত হয়, তা (مُخَلَّقَةٍ) আর যা বিনষ্ট ও পাত হওয়া অবধারিত, তা (وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ)। [৩৮] কোন কোন মুফাসসির (مُخَلَّقَةٍ) ও (وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ) এর এরূপ তাফসীর করেন যে, যে শিশুর সৃষ্টি পূর্ণাঙ্গ এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ, সুঠাম ও সুষম হয়, সে (مُخَلَّقَةٍ) অর্থাৎ পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট এবং যার কতক অঙ্গ অসম্পূর্ণ অথবা দৈহিক গড়ন ইত্যাদি অসম, সে (وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ)। [৩৩]

অর্থাৎ মাতৃগর্ভ থেকে তোমাদেরকে দুর্বল শিশুর আকারে বের করি। এ সময় শিশুর দেহ, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, জ্ঞান, নড়াচড়া ও ধারণশক্তি ইত্যাদি সবই দুর্বল থাকে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে এগুলোকে শক্তি দান করা হয় এবং পরিশেষে পূর্ণশক্তির স্তরে পৌছে যায়। [৩০]

অর্থাৎ, বীর্য থেকে চল্লিশ দিন পর জমাট রক্তে ও তা থেকে গোশতপিন্ডে পরিণত হয়। مُخَلَّقَة (পূর্ণাকৃতি) বলতে এমন ভ্রূণকে বুঝানো হয়েছে যার আকার-আকৃতি পরিপূর্ণ ও স্পষ্ট। এ রকম ভ্রূণের মধ্যে রূহ (আত্মা) ফুঁকে দেয়া হয়। আর غَير مُخَلَّقَة (অপূর্ণাকৃতি) এর বিপরীত; যার আকার-আকৃতি পূর্ণতা লাভ করে না এবং তাতে রূহও ফুঁকা হয় না। বরং সময়ের আগেই তা গর্ভচ্যুত হয়ে যায়। সহীহ হাদীসসমূহেও গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের এই সকল সৃষ্টি-পর্যায়ের কথা উল্লেখ হয়েছে। যেমন একটি হাদীসে আছে, নবী (সাঃ) বলেন, ''তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি (অর্থাৎ তার মূল উপাদান প্রথমে) ৪০ দিন তার মাতার গর্ভে শুক্ররূপে থাকে। অতঃপর ৪০ দিন লাল জমাট রক্ত পিন্ডরূপে অবস্থান করে, তৎপর ৪০ দিনে গোশত পিন্ডরূপ ধারণ করে। অতঃপর আল্লাহ তার নিকট এক ফিরিশতা পাঠিয়ে তার রূহ ফুঁকা হয়---।'' [৩৯] অর্থাৎ, চার মাস পর ভ্রূণে আত্মাদান করা হয় এবং তা পরিপূর্ণ মানবাকৃতিতে বিকাশ লাভ করে।

অর্থাৎ, এইভাবেই আমি আমার সৃষ্টিশক্তির নিপুণতা ও মহিমা তোমাদের জন্য প্রকাশ করি।

ii. সুরা আরাফে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

هُوَ الَّذِىۡ خَلَقَكُمۡ مِّنۡ نَّـفۡسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ

مِنۡهَا زَوۡجَهَا لِيَسۡكُنَ اِلَيۡهَا‌ ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰٮهَا حَمَلَتۡ حَمۡلاً خَفِيۡفًا فَمَرَّتۡ بِهٖ‌ ۚ فَلَمَّاۤ اَثۡقَلَتۡ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَـئِنۡ اٰتَيۡتَـنَا صَالِحًا لَّـنَكُوۡنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيۡنَ ﴿۱۸۹﴾

তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র সত্তা থেকে; আর তার থেকেই তৈরি করেছেন তার জোড়া, যাতে তার কাছে স্বস্তি পেতে পারে। অতঃপর পুরুষ যখন নারীকে আবৃত করল, তখন সে গর্ভবতী হল। অতি হালকা গর্ভ। সে তাই নিয়ে চলা ফেরা করতে থাকল। তারপর যখন বোঝা হয়ে গেল,তখন উভয়েই আল্লাহকে ডাকল যিনি তাদের পালনকর্তা যে,তুমি যদি আমাদিগকে সুস্থ ও ভাল দান কর তবে আমরা তোমার শুকরিয়া আদায় করব। [৪০]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসির ইবনে কাসিরে এসেছে, স্বামী যখন তার প্রকৃতিগত প্রেমের ভিত্তিতে স্বীয় স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করে তখন তার স্ত্রী প্রথমতঃ তার গর্ভাশয়ে একটা হালকা বোঝার অস্তিত্ব অনুভব করে। এতা হল গর্ভের সূচনার সময়। এই সময় নারীর কোন কষ্ট হয়না। কেননা, এই গর্ভ তো এখন সবে মাত্র নুতফা বা মাংসপিণ্ড। এখন ওটা হাল্কা-পাতলা অবস্থায় রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে-এই প্রাথমিক সময় হচ্ছে এমন এক সময় যখন তার নিজেরই এই সন্দেহ থেকে যায় যে, তার গর্ভ আছে কি নেই। মোট কথা এর পরে নারী তার পেটের গর্ভ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। তখন পিতা-মাতা দুজনই আল্লাহর কাছে এই কামনা করেছে, যদি তিনি তাদেরকে নিখুঁত ও সুন্দর সন্তান দান করেন তবে এটা তাঁর বড়ই ইহসান হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রঃ) বলেন, "মা-বাপের এই ভয়ও থাকে যে, না জানি হয়ত কোন পশুর আকৃতি বিশিষ্ট বা কোন অঙ্গহানি যুক্ত সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে যায় নাকি! যেমন কোন কোন সময় এরুপ হয়েও থাকে।" হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, এর

ভাবার্থ হচ্ছে, "যদি আল্লাহ আমাকে পুত্র সন্তান দান করেন।" কেননা সন্তানের মধ্যে পুত্র সন্তানই বেশি কাঙ্খিত হয়ে থাকে।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) স্বীয় মুসনাদে হাসান (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছে যে, নবী (সাঃ) বলেছেন, হাওয়া (আঃ) যখন সন্তান প্রসব করেন তখন ইবলিস তার কাছে আগমন করে। তার সন্তান বেঁচে থাকত না। শয়তান তাকে পরামর্শ দিল- "তোমার শিশুর নাম আব্দুল হারিস রাখ, তাহলে সে জীবিত থাকবে।" তখন তার নাম আব্দুল হারিস রাখা হয় এবং সে জীবিত থাকে। এটা ছিল শয়তানের পক্ষ থেকে অহী। হারিস শয়তানের নাম। হাদিসটি মা'রফু নয় বরং মওকুফ রুপে আহলে কিতাবের নিকট থেকে গ্রহন করা হয়েছে বলে হাদিস বিশারদরা উল্লেখ করেছেন। গর্ভ ছিল কি ছিল না এ ব্যাপারে হযরত হাওয়া (আঃ) এর মনে সন্দেহ ছিল। মোট কথা, যখন গর্ভ ভারী হয়ে উঠল তখন দুজনেই আল্লাহ তাআ'লার নিকট দুয়া করলেন যে, যদি তিনি সহিহ, সালিম ও নিখুঁত সন্তান দান করেন তবে তাঁরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবেন। [৩০]

মহান আল্লাহ তা'আলা সুরা লুকমানে বলেছেন,

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ

এবং আমি মানুষকে তার মাতা পিতা সম্বন্ধে তাকীদ দিয়েছি তার মাতা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে দুর্বলতার উপর দুর্বলতা সহ্য করে এবং তার দুধ ছাড়ানো দু'বছরের মধ্যে। এও যে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো আমার এবং আপন মাতা পিতার; শেষ পর্যন্ত আমারই নিকট আসতে হবে। [১৫]

এখানে যখন পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য পালন এবং তাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, তখন এর হেকমত ও অন্তর্নিহিত রহস্য এই বর্ণনা করেছেন যে, তার মা ধরাধামে তার আবির্ভাব ও অস্তিত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার ও অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছেন। নয় মাস কাল উদরে ধারণ করে তার রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন এবং এ কারণে ক্রমবর্ধমান দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছেন। আবার ভূমিষ্ট হওয়ার পরও দু'বছর পর্যন্ত স্তন্যদানের কঠিন ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। যাতে দিন-রাত মাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। ফলে তার দুর্বলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। আর সন্তানের লালন-পালন করার ক্ষেত্রে মাকেই যেহেতু অধিক বুকি-ঝামেলা বহন করতে হয়, সেজন্য শরীয়তে মায়ের স্থান ও অধিকার পিতার অগ্রে রাখা হয়েছে। যদি পিতা-মাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা না হয় তাতে আল্লাহরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় না। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে কেউ মানুষের কাছে কৃতজ্ঞ হয় না সে আল্লাহর কাছেও কৃতজ্ঞ হতে পারে না।" [৪১]

সুরা লুকমানের এই আয়াতে হযরত লুকমান তাঁর ছেলেকে দ্বিতীয় উপদেশ যা দেন সেটাও গুরুত্বের দিক দিয়ে বাস্তবিকই এমন যে, প্রথম উপদেশের (একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করোনা) সাথে এটা মিলিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ পিতা-মাতার প্রতি ইহসান করা ও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা। যেমনঃ আল্লাহ তাআ'লা অন্য আয়াতে বলেন,

وَ قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعۡبُدُوۡۤا اِلَّاۤ اِیَّاهُ وَ بِالۡوَالِدَیۡنِ اِحۡسَانًا ؕ اِمَّا یَبۡلُغَنَّ عِنۡدَکَ الۡکِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوۡ کِلٰهُمَا فَلَا تَقُلۡ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّ لَا تَنۡهَرۡهُمَا وَ قُلۡ لَّهُمَا قَوۡلًا کَرِیۡمًا ﴿۲۳﴾

আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল। [৪২]

গর্ভধারণ অবস্থায় মা কষ্ট, দুর্বলতা সহ্য করে থাকেন। অতঃপর মা সন্তানকে দুবছর পর্যন্ত দুগ্ধ পান করিয়ে থাকেন। এই দুবছর ধরে মাকে তার শিশু সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্বভার গ্রহন করতে হয়। যেমন, অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ ۞وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]

"আর জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর স্তন্য পান করাবে, এটা সে ব্যক্তির জন্য, যে স্তন্যপান কাল পূর্ণ করতে চায়। পিতার কর্তব্য যথাবিধি তাদের (মাতাদের) ভরণ-পোষণ করা।" [৪৩]

iii. সুরা আহকাফে আছে,

﴿وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ إِحۡسَٰنًاۖ حَمَلَتۡهُ أُمُّهُۥ كُرۡهٗا وَوَضَعَتۡهُ كُرۡهٗاۖ وَحَمۡلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهۡرًاۚ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَبَلَغَ أَرۡبَعِينَ سَنَةٗ قَالَ رَبِّ أَوۡزِعۡنِيٓ أَنۡ أَشۡكُرَ نِعۡمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَيَّ وَأَنۡ أَعۡمَلَ صَٰلِحٗا تَرۡضَىٰهُ وَأَصۡلِحۡ لِي فِي ذُرِّيَّتِيٓۖ إِنِّي تُبۡتُ إِلَيۡكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ١٥ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنۡهُمۡ أَحۡسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّـَٔاتِهِمۡ فِيٓ أَصۡحَٰبِ ٱلۡجَنَّةِۖ وَعۡدَ ٱلصِّدۡقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ١٦﴾ [الاحقاف: ١٥، ١٦]

"আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে। যাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়তে লেগেছে ত্রিশ মাস। অবশেষে সে যখন শক্তি সামর্থ্যের বয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌঁছেছে, তখন বলতে লাগল, হে আমার রব! আমাকে এরূপ ভাগ্য দান কর, যাতে আমি তোমার নি'আমতের শোকর করি, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎ কাজ করি। আমার সন্তানদেরকে সৎকর্ম পরায়ণ কর, আমি তোমার প্রতি তাওবা করলাম এবং আমি আজ্ঞাবহদের অন্যতম। আমরা এমন লোকদের সুকর্মগুলো কবুল করি এবং মন্দ কর্মগুলো মার্জনা করি। তারা জান্নাতীদের তালিকাভুক্ত সেই সত্য ওয়াদার কারণে, যা তাদেরকে দেওয়া হতো"। [৪৪]

অর্থাৎ পিতা-মাতার সেবা যত্ন ও আনুগত্য জরুরি হওয়ার এক কারণ এই যে, তারা তোমাদের জন্যে অনেক কষ্টই সহ্য করেন। বিশেষত মাতার কষ্ট অনেক বেশি হয়ে থাকে। এখানে কেবল মাতার কষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। মাতা দীর্ঘ নয় মাস তোমাদেরকে গর্ভে ধারণ করে। এছাড়া এ সময়ে তাকে অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়। এরপর প্রসবকালে অসহনীয় প্রসব বেদনার পর তোমরা ভূমিষ্ঠ হও।

আয়াতের শুরুতেই পিতা-মাতা উভয়ের সাথে সদ্ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এ স্থলে কেবল মাতার কষ্টের কথা উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে, মাতার পরিশ্রম ও কষ্ট অপরিহার্য ও জরুরী। গর্ভধারণের সময় কষ্ট, প্রসব বেদনার কষ্ট সর্বাবস্থায় ও সব সন্তানের ক্ষেত্রে মাতাকেই সহ্য করতে হয়। পিতার জন্যে লালন পালনের কষ্ট সহ্য করা সর্বাবস্থায় জরুরি হয় না। পিতা ধনাঢ্য হলে এবং তার চাকর বাকর থাকলে অপরের মাধ্যমে সন্তান দেখাশোনা করতে পারে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সন্তানের ওপর মাতার হক বেশি রেখেছেন।[৩০]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং আরও বড় বড় ইমামগন দলীল গ্রহন করেছেন যে, গর্ভধারণের সময় কমপক্ষে ছয় মাস হবে। মায়ের কষ্টের কথা সন্তানের সামনে এ জন্যই প্রকাশ করা হচ্ছে যে, যেন সন্তান মায়ের এই মেহেরবানীর কথা স্মরণ করে মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, আনুগত্য ও ইহসান করে। মহান আল্লাহ তাআ'লা নির্দেশ দেন,

وَ اخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحۡمَۃِ وَ قُلۡ رَّبِّ ارۡحَمۡهُمَا کَمَا رَبَّیٰنِیۡ صَغِیۡرًا ﴿۲۴﴾

আর তাদের উভয়ের জন্য দয়াপরবশ হয়ে বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং বল, 'হে আমার রব, তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন'। [৪৫]

এখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। তোমাদের প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট। সুতরাং যদি তোমরা আমার এ আদেশ মেনে নাও তবে আমি তোমাদেরকে এর পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবো। [৩০]

iv. সুরা মারইয়ামে আল্লাহ তা'আলা মারইয়াম (আঃ)-এর গর্ভধারনের প্রসঙ্গে বলেছেন,

فَحَمَلَتۡهُ فَانۡتَبَذَتۡ بِهٖ مَکَانًا قَصِیًّا ﴿۲۲﴾

তারপর সে তাকে গর্ভে ধারণ করল এবং তা নিয়ে দূরবর্তী একটি স্থানে চলে গেল। [৪৬]

এখানে দূরবর্তী স্থানে মানে বাইত লাহিম। [কুরতুবী] কাতাদা বলেন, পূর্বদিকে। [তাবারী] মারইয়াম আলাইহাস সালাম হঠাৎ গর্ভধারণ করলেন। এ অবস্থায় যদি তিনি নিজের ইতিকাফের জায়গায় বসে থাকতেন এবং লোকেরা তাঁর গর্ভধারণের কথা জানতে পারতো, তাহলে শুধুমাত্র পরিবারের লোকেরাই নয়, সম্প্রদায়ের অন্যান্য লোকরাও তাঁর জীবন ধারণ কঠিন করে দিতো। তাই তিনি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবার পর ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত নিজ সম্প্রদায়ের তিরস্কার, নিন্দাবাদ ও ব্যাপক দুর্ণাম থেকে রক্ষা পান। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম যে পিতা ছাড়াই হয়েছিল এ ঘটনাটি নিজেই তার একটি বিরাট প্রমাণ। যদি তিনি বিবাহিত হতেন এবং স্বামীর ঔরসে সন্তান জন্মলাভের ব্যাপার হতো তাহলে তো সন্তান প্রসবের জন্য তাঁর শ্বশুরালয়ে বা পিতৃগৃহে না গিয়ে একাকী একটি দূরবর্তী স্থানে চলে যাওয়ার কোন কারণই ছিল না। সুতরাং নাসারাদের মিথ্যাচার এখানে স্পষ্ট। তারা তাকে বিবাহিত বানিয়ে ছাড়ছে।

v. আল্লাহ তাআ'লা সুরা আন-নাযমের ৩২ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন,

اَلَّذِیۡنَ یَجۡتَنِبُوۡنَ کَبٰٓئِرَ الۡاِثۡمِ وَ الۡفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ؕ اِنَّ رَبَّکَ وَاسِعُ الۡمَغۡفِرَۃِ ؕ هُوَ اَعۡلَمُ بِکُمۡ اِذۡ اَنۡشَاَکُمۡ مِّنَ الۡاَرۡضِ وَ اِذۡ اَنۡتُمۡ اَجِنَّۃٌ فِیۡ بُطُوۡنِ اُمَّهٰتِکُمۡ ۚ فَلَا تُزَکُّوۡۤا اَنۡفُسَکُمۡ ؕ هُوَ اَعۡلَمُ بِمَنِ اتَّقٰی ﴿۳۲﴾

যারা ছোট খাট দোষ-ত্রুটি ছাড়া বড় বড় পাপ ও অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকে, নিশ্চয় তোমার রব ক্ষমার ব্যাপারে উদার, তিনি তোমাদের ব্যাপারে সম্যক অবগত। যখন তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যখন তোমরা তোমাদের মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে ছিলে। কাজেই তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। কে তাকওয়া অবলম্বন করেছে, সে সম্পর্কে তিনিই সম্যক অবগত। [৪৭] এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে একটি বর্ণনা এসেছে, সাবেত ইবনুল হারিস আনসারী বলেন, ইয়াহূদীদের কোন সন্তান ছোট অবস্থায় মারা গেলে তারা তাকে বলত, সে সিদ্দীকীনের মর্যাদায় পৌছে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ কথা পৌছলে তিনি বললেন, ইয়াহুদীরা

মিথ্যা বলেছে। কোন সন্তান তার মায়ের পেটে থাকতেই তার সৌভাগ্যবান হওয়া বা দূর্ভাগা হওয়া লিখে নেয়া হয়েছে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন। [৪৮]

vi. সুরা আত ত্বলাক্ব-এর ৪ ও ৬ নং আয়াতে গর্ভধারণ, ইদ্দত ও তালাকের বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াতে কারীমে লক্ষণীয় যে, আল্লাহ আজ্বওয়াজা গর্ভবতী নারীদের অসহায় অবস্থার উপর লক্ষ্য করে তালাকের বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

وَ الّٰٓـِٔیۡ یَئِسۡنَ مِنَ الۡمَحِیۡضِ مِنۡ نِّسَآئِکُمۡ اِنِ ارۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَۃُ اَشۡهُرٍ ۙ وَّ الّٰٓـِٔیۡ لَمۡ یَحِضۡنَ ؕ وَ اُولَاتُ الۡاَحۡمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنۡ یَّضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ ؕ وَ مَنۡ یَّتَّقِ اللّٰهَ یَجۡعَلۡ لَّهٗ مِنۡ اَمۡرِهٖ یُسۡرًا ﴿۴﴾

তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা ঋতুবর্তী হওয়ার কাল অতিক্রম করে গেছে, তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা যদি সংশয়ে থাক এবং যারা এখনও ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি তাদের ইদ্দতকালও হবে তিন মাস। আর গর্ভধারিনীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য তার কাজকে সহজ করে দেন। [৪৯]

اَسۡکِنُوۡهُنَّ مِنۡ حَیۡثُ سَکَنۡتُمۡ مِّنۡ وُّجۡدِکُمۡ وَ لَا تُضَآرُّوۡهُنَّ لِتُضَیِّقُوۡا عَلَیۡهِنَّ ؕ وَ اِنۡ کُنَّ اُولَاتِ حَمۡلٍ فَاَنۡفِقُوۡا عَلَیۡهِنَّ حَتّٰی یَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ ۚ فَاِنۡ اَرۡضَعۡنَ لَکُمۡ فَاٰتُوۡهُنَّ اُجُوۡرَهُنَّ ۚ وَ اۡتَمِرُوۡا بَیۡنَکُمۡ بِمَعۡرُوۡفٍ ۚ وَ اِنۡ تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهٗۤ اُخۡرٰی ؕ﴿۶﴾

তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেখানে তোমরা বসবাস কর সেখানে তাদেরকেও বাস করতে দাও, তাদেরকে সঙ্কটে ফেলার জন্য কষ্ট দিয়ো না। আর তারা গর্ভবতী হলে তাদের সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তাদের জন্য তোমরা ব্যয় কর; আর তারা তোমাদের জন্য সন্তানকে দুধ পান করালে তাদের পাওনা তাদেরকে দিয়ে দাও এবং (সন্তানের কল্যাণের জন্য) সংগতভাবে তোমাদের মাঝে পরস্পর পরামর্শ কর। আর যদি তোমরা পরস্পর কঠোর হও তবে পিতার পক্ষে অন্য কোন নারী দুধপান করাবে। [৫০]

অর্থাৎ, তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যদি গর্ভবতী হয়, তবে তার ভরণ-পোষণ ও বাসস্থান দেওয়া জরুরী, যদিও এ তালাক 'বায়েনাহ' (যে তালাকের পর ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার থাকে না তা) হয়। এ কথা পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে।

অর্থাৎ, তালাক দেওয়ার পর তারা যদি তোমাদের শিশুদেরকে দুধ পান করায়, তাহলে তার পারিশ্রমিক তোমাদেরকেই দিতে হবে। (তখন 'সম্পর্ক নেই বলে কোন অর্থ ব্যয় করব না' বলা চলবে না।)

vii. সুরা আলে ইমরানে মহান আল্লাহ পাক বলেন,

هُوَ الَّذِیۡ یُصَوِّرُکُمۡ فِی الۡاَرۡحَامِ کَیۡفَ یَشَآءُ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ ﴿۶﴾

তিনিই মাতৃগর্ভে তোমাদেরকে আকৃতি দান করেন যেভাবে তিনি চান। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। [৫১]

কাতাদা বলেন, আল্লাহর শপথ, আমাদের রব তার বান্দাদেরকে মায়ের গর্ভে যেভাবে ইচ্ছা গঠন করতে পারেন। ছেলে বা মেয়ে, কালো বা গৌরবর্ণ, পূর্ণসৃষ্টি অথবা অপূর্ণসৃষ্টি। [৫২]

viii. সুরা আন-নাহলে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ اللّٰهُ اَخۡرَجَكُمۡ مِّنۡۢ بُطُوۡنِ اُمَّهٰتِكُمۡ لَا تَعۡلَمُوۡنَ شَيۡئًا ۙ وَّ جَعَلَ لَكُمُ السَّمۡعَ وَ الۡاَبۡصَارَ وَ الۡاَفۡـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُوۡنَ ﴿۷۸﴾

আর আল্লাহ তোমাদেরকে বের করেছেন, তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে এমতাবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন শ্রবণশক্তি, চক্ষু ও অন্তর। যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর। [৫৩]

অর্থাৎ এমন সব উপকরণ যার সাহায্যে তোমরা দুনিয়ার সব রকমের জ্ঞান ও তথ্য সংগ্রহ করে দুনিয়ার যাবতীয় কাজ কর্ম চালাবার যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছো। জন্মকালে মানব সন্তান যত বেশী অসহায় ও অজ্ঞ হয় এমনটি অন্য কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে হয় না। কিন্তু শুধুমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উপকরণাদির (শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টিশক্তি, বিবেক ও চিন্তাশক্তি) সাহায্যেই সে উন্নতি লাভ করে পৃথিবীর সকল বস্তুর ওপর প্রাধান্য বিস্তার এবং তাদের ওপর রাজত্ব করার যোগ্যতা অর্জন করে। আয়াতের শেষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার অর্থ, এগুলোকে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিতে কাজে লাগানো। সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টি যাতে হয় তাই শুধু সে করবে।[৩০]

x) সুরা আল- মুমিনুনের ১২-১৪ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আবারও সৃষ্টির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

وَ لَقَدۡ خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ مِنۡ سُلٰلَۃٍ مِّنۡ طِیۡنٍ ﴿۱۲﴾

আর অবশ্যই আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি। [৫৪]

سلالة শব্দের অর্থ সারাংশ এবং طين অর্থ আদ্র মাটি। [৩৩] অর্থ এই যে, পৃথিবীর মাটির বিশেষ অংশ বের করে তা দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। [৩৩] মানব সৃষ্টির সূচনা আদম আলাইহিস সালাম থেকে এবং তার সৃষ্টি মাটির সারাংশ থেকে হয়েছে। তাই প্রথম সৃষ্টিকে মাটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। এরপর এক মানুষের শুক্র অন্য মানুষের সৃষ্টির কারণ হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে(ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً) "তারপর আমরা তাকে করে দিয়েছি বীর্য" বলে এ কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রাথমিক সৃষ্টি মাটি দ্বারা হয়েছে, এরপর আদম সন্তানদের সৃষ্টিধারা এই মাটির সূক্ষ্ম অংশ অর্থাৎ শুক্র দ্বারা চালু করা হয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদগণ আয়াতের এ তফসীরই লিখেছেন। [৩৩] মুজাহিদ বলেন, এখানে (سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ) বলে মানুষের শুক্রই বোঝানো হয়েছে। তখন অর্থ হবে, পরিষ্কার নিংড়ানো পানি হতে তৈরী করেছি। ইবন আব্বাস থেকেও এ অর্থ বর্ণিত আছে। [৩০]

ثُمَّ خَلَقۡنَا النُّطۡفَۃَ عَلَقَۃً فَخَلَقۡنَا الۡعَلَقَۃَ مُضۡغَۃً فَخَلَقۡنَا الۡمُضۡغَۃَ عِظٰمًا فَکَسَوۡنَا الۡعِظٰمَ لَحۡمًا * ثُمَّ اَنۡشَاۡنٰہُ خَلۡقًا اٰخَرَ ؕ فَتَبٰرَکَ اللّٰہُ اَحۡسَنُ الۡخٰلِقِیۡنَ ﴿۱۴﴾

তারপর শুক্রকে আমি 'আলাকায় পরিণত করি। তারপর 'আলাকাকে গোশতপিন্ডে পরিণত করি। তারপর গোশতপিন্ডকে হাড়ে পরিণত করি। তারপর হাড়কে গোশ্ত দিয়ে আবৃত করি। অতঃপর তাকে অন্য এক সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলি। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত বরকতময়! [৫৫]

আলোচ্য আয়াতসমূহে মানব সৃষ্টির সাতটি স্তর উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম স্তর মৃত্তিকার সারাংশ, দ্বিতীয় বীর্য, তৃতীয় জমাট রক্ত, চতুর্থ মাংসপিণ্ড, পঞ্চম অস্থি-পিঞ্জর, ষষ্ঠ অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃতকরণ ও সপ্তম সৃষ্টিটির পূর্ণত্ব অর্থাৎ রূহ সঞ্চারকরণ। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে এ শেষোক্ত স্তরকে এক বিশেষ ও স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে বর্ণনা করে বলেছেনঃ "তারপর আমরা তাকে এক বিশেষ ধরনের সৃষ্টি দান করেছি।" এই বিশেষ বর্ণনার কারণ এই যে, প্রথমোক্ত ছয় স্তরে সে পূর্ণত্ব লাভ করেনি। শেষ স্তরে এসে সে সম্পূর্ণ এক মানুষে পরিণত হয়েছে। এ কথাই বিভিন্ন

তাফসীরকারকগণ বলেছেন। তারা বলেন, এ স্তরে এসে তার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা রূহ সঞ্চার করিয়েছেন। [৩০] কোন কোন মুফাস্‌সির বলেন, "তারপর আমরা তাকে এক বিশেষ ধরনের সৃষ্টি দান করেছি।" এর অর্থ তাকে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে নিয়ে গেছি। প্রথমে শিশু, তারপর ছোট, তারপর কৈশোর, তারপর যুবক, তারপর পূর্ণবয়স্ক, তারপর বৃদ্ধ, তারপর অতি বয়স্ক। বস্তুত দুটি অর্থের মধ্যে বিরোধ নেই। কারণ, রূহ ফুঁকে দেয়ার পর এসবই সংঘটিত হয়। [৩০]

xi)সুরা আল ফাতিরে মহান আল্লাহ পাক মানব সৃষ্টি রহস্যের কথা আবারো বলেছেনঃ

وَ اللّٰهُ خَلَقَكُمۡ مِّنۡ تُرَابٍ ثُمَّ مِنۡ نُّطۡفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمۡ اَزۡوَاجًا ؕ وَ مَا تَحۡمِلُ مِنۡ اُنۡثٰی وَ لَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلۡمِهٖ ؕ وَ مَا یُعَمَّرُ مِنۡ مُّعَمَّرٍ وَّ لَا یُنۡقَصُ مِنۡ عُمُرِهٖۤ اِلَّا فِیۡ کِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِکَ عَلَی اللّٰهِ یَسِیۡرٌ ﴿۱۱﴾

আর আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে তারপর শুক্রবিন্দু থেকে তারপর তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন এবং নারী তার গর্ভে যা ধারণ করে আর যা প্রসব করে তা আল্লাহর জ্ঞাতসারেই হয়। আর কোন বয়স্ক ব্যক্তির বয়স বাড়ানো হয় না কিংবা কমানো হয় না কিন্তু তা তো রয়েছে কিতাবে; নিশ্চয় তা আল্লাহর জন্য সহজ। [৫৬]

মহান রব্বের নিকট কোন বস্তুই লুক্কায়িত নয়, এমনকি মাটির উপর যে পাতা পড়ে তার শব্দও এবং পৃথিবীর অন্ধকারে (মাটির ভিতর) অঙ্কুরিত হতে থাকা বীজের খবরও তিনি রাখেন। আয়ু কম-বেশি হওয়া আল্লাহর ফায়সালা ও তকদীর অনুযায়ী হয়ে থাকে। এ ছাড়া অতিরিক্ত কিছু কারণও আছে যার ফলে আয়ু কম-বেশি হয়। আয়ু বৃদ্ধির কারণসমূহের মধ্যে একটি কারণ হল, আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা; যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আর তা কম হওয়ার কারণসমূহের মধ্যে একটি কারণ বেশি বেশি পাপ করা। উদাহরণ স্বরূপঃ কোন মানুষের আয়ু সত্তর বছর। কিন্তু কখনো বৃদ্ধির কারণ বিদ্যমান থাকায় আল্লাহ তাতে বৃদ্ধি করে দেন। আর যখন হ্রাস পাওয়ার কারণ বিদ্যমান থাকে, তখন হ্রাস করে দেন। পরন্তু এ হ্রাস-বৃদ্ধির কথা তিনি 'লাওহে মাহফুয'-এ লিখে রেখেছেন। ফলে আয়ুর কম-বেশি হওয়া (فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ) অর্থাৎ, যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা মুহূর্তকালও বিলম্ব বা ত্বরা করতে পারবে না। [৫৭]এর পরিপন্থী নয়। মহান আল্লাহর এই কথা দ্বারাও তার সমর্থন পাওয়া যায় (يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ) অর্থাৎ, আল্লাহ যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন এবং বহাল রাখেন। আর মূলগ্রন্থ তাঁর কাছেই রয়েছে।''[৫৮]

xii) সুরা আয-যুমারে মহান আল্লাহ পাক গর্ভের ভেতরের তিনটি স্তরের বিবরন এনেছেন, যা মেডিক্যাল সায়েন্স এর বিস্ময়কর এক বিষয়।

خَلَقَكُمۡ مِّنۡ نَّفۡسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَ اَنۡزَلَ لَكُمۡ مِّنَ الۡاَنۡعَامِ ثَمٰنِیَةَ اَزۡوَاجٍ ؕ یَخۡلُقُكُمۡ فِیۡ بُطُوۡنِ اُمَّهٰتِكُمۡ خَلۡقًا مِّنۡۢ بَعۡدِ خَلۡقٍ فِیۡ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمۡ لَهُ الۡمُلۡکُ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰی تُصۡرَفُوۡنَ ﴿۶﴾

তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নাফস থেকে, তারপর তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদ জন্তু থেকে তোমাদের জন্য দিয়েছেন আট জোড়া; তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন তোমাদের মাতৃগর্ভে; এক সৃষ্টির পর আরেক সৃষ্টি, ত্রিবিধ অন্ধকারে; তিনিই আল্লাহ; তোমাদের রব; রাজত্ব তাঁরই; তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তারপরও তোমাদেরকে কোথায় ফিরানো হচ্ছে? [৫৯]

এই আয়াতে এক নাফস থেকে সৃষ্টি অর্থ আদম (আঃ) থেকে, তাঁকে আল্লাহ তাআলা নিজ হাত দ্বারা তৈরী করেছিলেন এবং তাঁর মধ্যে নিজ রূহ ফুঁকেছিলেন। হাওয়াকে আদম (আঃ)-এর বামপার্শ্বের অস্থি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং এটাও তাঁর কুদরতের বড় কৃতিত্ব। কারণ হাওয়া ছাড়া কোন নারীর সৃষ্টি কোন পুরুষের অস্থি থেকে হয়নি। ফলে হাওয়ার সৃষ্টি সাধারণ নিয়ম-বহির্ভূত এবং আল্লাহর মহাশক্তির একটি নিদর্শন।

এই আয়াতে সেই চার প্রকার চতুষ্পদ জন্তুর (ছাগল, ভেঁড়া, উট, গরু) বর্ণনা হয়েছে, যা নর ও মাদা মিলে আট প্রকার হচ্ছে, যার বর্ণনা সূরা আনআমের ১৪৩-১৪৪নং আয়াতে হয়েছে। أَنْزَلَ خَلَقَ(সৃষ্টির) অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অথবা এক বর্ণনায় এসেছে যে, আল্লাহ তাআলা প্রথমে এই সকল চতুষ্পদ জন্তুকে জান্নাতে সৃষ্টি করেছিলেন এবং পরে তাদেরকে অবতীর্ণ করেন। সুতরাং এক্ষেত্রে إنزال এর মূল অর্থ ধরতে হবে। অথবা أَنْزَلَশব্দ এখানে রূপক অর্থে ব্যবহার হয়েছে। কারণ এসব চতুষ্পদ জন্তু ঘাস-পাতা ছাড়া বাঁচতে পারে না। আর ঘাস-পাতার জন্য আকাশ থেকে অবতীর্ণ পানি নিতান্ত জরুরী। তাই মূলতঃ চতুষ্পদ জন্তু আকাশ থেকেই অবতীর্ণ হয়েছে বলা যায়। (ফাতহুল ক্বাদীর)

এখানে প্রথম অন্ধকার মায়ের পেট, দ্বিতীয় গর্ভাশয়, তৃতীয় ঝিল্লী; সেই পাতলা আবরণ যাতে বাচ্চা জড়ানো থাকে। ভ্রূণ মাতৃগর্ভে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে, প্রথমে বীর্য, অতঃপর রক্তপিন্ড, অতঃপর গোশতপিন্ড, অতঃপর অস্থির গঠন, তার উপর মাংসের আবরণ। এই সকল স্তর অতিক্রম করার পর পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈরী হয়। [৩০]

সন্তান হত্যার পাপ নিয়ে কুর'আনের উক্তিঃ

এই পৃথিবীতে কেউ আছে সন্তানের জন্য হাহাকার করে, আবার কেউ এই নেয়ামত পেয়েও খুশি হয়না, বরং শয়তানের ধোঁকায় পরে গর্ভের সন্তান হত্যার মত অপকর্ম চালায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍۖ لَا تَقۡتُلُوۡۤا اَوۡلَادَکُمۡ خَشۡیَۃَ اِمۡلَاقٍ ؕ نَحۡنُ نَرۡزُقُہُمۡ وَ اِیَّاکُمۡ ؕ اِنَّ قَتۡلَہُمۡ کَانَ خِطۡاً کَبِیۡرًا ﴿۳۱﴾

অভাব-অনটনের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমিই তাদেরকে রিযক দেই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। [৬০]

আলোচ্য আয়াতে এই নির্দেশটি জাহেলিয়াত যুগের একটি নিপীড়নমূলক অভ্যাস সংশোধনের নিমিত্ত উল্লেখিত হয়েছে। জাহেলিয়াত যুগে কেউ কেউ জন্মের পরপরই সন্তানদেরকে বিশেষ করে কন্যা সন্তানদেরকে হত্যা করত, যাতে তাদের ভরণ-পোষণের বোঝা বহন করতে না হয়। এক হাদীসে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এটা অবশ্যই বড় কিন্তু তারপর কি? তিনি বললেন, এবং তোমার সাথে খাবে এ ভয়ে তোমার সন্তানকে হত্যা করা"। [৬১]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা তাদের এই কর্মপন্থাটি যে অত্যন্ত জঘন্য ও ভ্রান্ত তাই সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। অনুধাবন করতে বলেছেন যে, রিযিকদানের তোমরা কে? এটা তো একান্তভাবে আল্লাহ্ তাআলার কাজ। তোমাদেরকেও তো তিনিই রিযিক দিয়ে থাকেন। যিনি তোমাদেরকে দেন, তিনিই তাদেরকেও দেবেন। তোমরা এ চিন্তায় কেন সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী হচ্ছে? [৬২]

এই নির্দেশ সূরা আনআম ১৫১ নং আয়াতেও উল্লেখ হয়েছে।

قُلۡ تَعَالَوۡا اَتۡلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمۡ عَلَيۡكُمۡ اَلَّا تُشۡرِكُوۡا بِهٖ شَيۡئًا وَّ بِالۡوَالِدَيۡنِ اِحۡسَانًا ۚ وَ لَا تَقۡتُلُوۡۤا اَوۡلَادَكُمۡ مِّنۡ اِمۡلَاقٍ ؕ نَحۡنُ نَرۡزُقُكُمۡ وَ اِيَّاهُمۡ ۚ وَ لَا تَقۡرَبُوا الۡفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَ مَا بَطَنَ ۚ وَ لَا تَقۡتُلُوا النَّفۡسَ الَّتِيۡ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالۡحَقِّ ؕ ذٰلِكُمۡ وَصّٰكُمۡ بِهٖ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُوۡنَ ﴿۱۵۱﴾

বল, 'এসো, তোমাদের উপর তোমাদের রব যা হারাম করেছেন, তা তিলাওয়াত করি যে, তোমরা তার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না এবং মা-বাবার প্রতি ইহসান করবে আর দারিদ্রের কারণে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না। আমিই তোমাদেরকে রিযক দেই এবং তাদেরকেও। আর অশ্লীল কাজের নিকটবর্তী হবে না- তা থেকে যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে। আর বৈধ কারণ ছাড়া তোমরা সেই প্রাণকে হত্যা করো না, আল্লাহ যা হারাম করেছেন। এগুলো আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার। [৬৩]

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সাঃ) শিরকের পর যে গুনাহকে সবচেয়ে বড় গণ্য করেছেন, তা হল এই (أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ) ''তোমার নিজ সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করা যে, সে তোমার সাথে খাবে।'' [৬৪] ইদানীং সন্তান হত্যার এই মহাপাপ অতীব সুশৃঙ্খল নিয়মে 'জন্মনিয়ন্ত্রণ'-এর সুন্দর নামে সারা পৃথিবীতে চলছে। পুরুষরা 'উত্তম শিক্ষা ও তরবিয়ত' (বা 'ছোট পরিবার, সুখী সংসার') এর নামে এবং মহিলারা তাদের দেহের 'সুষমা' অক্ষয় রাখার জন্য ব্যাপকহারে ('আমরা দুই আমাদের দুই' শ্লোগান দিয়ে) এই অপরাধ করে চলেছে। أَعَاذَنَا اللهُ مِنْهُ। [৬৫]

মানুষ করার ভয় কোন ভয় নয়। মানুষ করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করলে আল্লাহ সাহায্য করবেন।

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً﴾

''আল্লাহকে যে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য সমাধান সহজ করে দেন।'' [৬৬]

তাছাড়া কত সন্তান অমানুষের ঘরেও মানুষরূপে গড়ে উঠে। কোন্ অসীলায় কে মানুষ হয়ে যায়, কে বলতে পারে? আবার কত বাপের একমাত্র ছেলেও অমানুষ হয়েই থেকে যায়। বাস্তবই তার প্রমাণ। ডঃ জাকির নায়েক তাঁর এক লেকচারে বলেছিলেন, তিনি তাঁর বাবা-মায়ের ৫ম সন্তান। তাঁর বাবা-মা যদি জন্ম নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি গ্রহণ করতেন, তাহলে তাঁর জন্মই হতোনা। [১৯০]

সুতরাং টিউবেক্ট্যামি বা ভ্যাসেক্ট্যামির মাধ্যমে বা গর্ভাশয় তুলে ফেলে জন্মের পথ একেবারে বন্ধ করে দেওয়া বৈধ নয়। অবশ্য যদি মহিলার প্রসবের সময় দমবন্ধ হওয়ার (প্রাণ যাওয়ার) ভয় থাকে অথবা সীজ্যার ছাড়া তার প্রসবই না হয়, তবে এমন সঙ্কটের ক্ষেত্রে অগত্যায় জন্ম-উপায় নির্মূল করা বৈধ হবে।

কিন্তু একেবারে নির্মূল না করে কিছু সময়ের জন্য বন্ধ রাখা যায় কি না? স্ত্রী যদি প্রত্যেক বৎসর সন্তান দিয়ে দুর্বল ও রোগা হয়ে যায় বা ঘন-ঘন সন্তান দানের ফলে কোন স্ত্রীরোগ তাকে পীড়িতা করে তোলে, তাহলে ট্যাবলেট আদি ব্যবহার করে দুই সন্তানের মাঝের সময়কে কিছু লম্বা করা বৈধ। এর বৈধতা রসূল (ﷺ) এর যুগে কিছু সাহাবীর আযল (সঙ্গমে বীর্যস্খলনের সময় যোনীপথের বাইরে বীর্যপাত করা) থেকে প্রমাণিত হয়। [৬৭]

গর্ভবতীর জীবন যাওয়ার আশঙ্কা না হলে গর্ভের ৪/৫ মাস পর ভ্রূণ নষ্ট করা বা গর্ভপাত করা হারাম। কারণ, তা জীবিত এক প্রাণহত্যার শামিল। ৪ মাস পূর্বে কোন রোগ বা ক্ষতির আশঙ্কায় একান্ত প্রয়োজনে বৈধ।

সীজ্যার করে সন্তান প্রসবও বৈধ। মায়ের জান বাঁচাতে মৃত ভ্রূণ অপারেশন করে বের করা ওয়াজেব। যেমন মৃতগর্ভিণীর গর্ভে যদি জীবিত ভ্রূণ থাকে এবং সীজ্যার করে বের করলে তার বাঁচার আশা থাকে, তবে মৃতার সীজ্যার বৈধ; নচেৎ নয়। [৬৮]

ভ্রূণের বয়স ৪ মাস পূর্ণ হয়ে নষ্ট হলে বা করলে তার আকীকা করা উত্তম। [৬৯]

গর্ভকালীন আমল ও আমলের ফযিলতসমুহ

পূর্বে উল্লেখিত গর্ভাবস্থার ফজিলত ও সওয়াব হাসিল করতে প্রয়োজন যথাযথ আমল। নিম্নে গর্ভকালীন সময়ের কতিপয় আমল উল্লেখ করা হল। সেই সঙ্গে আমলের ফজিলতও উল্লেখ করা হল। এখানে উল্লেখ্য, কিছু আমল আছে যেটার মধ্যে অন্য আমলও অন্তর্ভুক্ত। যেমন, সলাত আদায়, কুরআন তেলাওয়াত, ইস্তেগফার ভাল কাজ হিসেবে গণ্য হবে, আবার যিকির এর মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত হবে। আমাদের দেখতে হবে, আমরা এই মুহূর্তে যা কাজ করছি, তা কি আল্লাহকে খুশি করবে না ক্রোধের কারণ হবে। এই তাকওয়া অর্জন করতে পারলে নিম্মের কাজগুলো করা সুধু গর্ভাবস্থায় নয়, বরং সব সময়ের জন্য সহজ হবে।

i. নিয়্যাতের পরিশুদ্ধি

গর্ভাবস্থায় শুরু থেকেই নিয়্যাতের পরিশুদ্ধির ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে। বলা হয়ে থাকে নিয়্যাতেই বরকত। গর্ভাবস্থায় একজন নারী যত সহজে আল্লাহ তা'আলার নিকটতম বান্দী হতে পারে, তা অন্য সময়ে বেশ কঠিন। তাই সবচে প্রাথমিক ও সহজ কাজ হোল নিয়্যাত যাচাই করে নেয়া। সন্তান গ্রহন কি দুনিয়াবি উদ্দেশ্যে নাকি আখিরাতের পুঁজি এটা নিজেকে ঠিক করে সেই অনুযায়ী আমল করতে হবে। আখিরাতের নিমিত্তে সন্তান গ্রহন দুই জাহানেই সুস্পষ্ট বড় বিনিয়োগ। আখিরাতের জন্য পৃথিবীতে আনা এই সন্তান আল্লাহর আমানত। তার দেখাশোনা, লালন পালনের জন্য সাহায্য আল্লাহর তরফ থেকে যেন হয়, নিয়্যাত ঠিক করে আমরা আল্লাহর সাহায্য চেয়ে নিব। নিয়্যাতের উপর বিখ্যাত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হযরত উমার (রা)। হাদিসটি নিম্মরুপঃ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ـ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ ـ عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم ".

উমর (রাঃ) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, আমলের ফলাফল নির্ভর করে নিয়্যাতের উপর। সুতরাং যার হিজরত হয় দুনিয়া লাভের জন্য কিংবা কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে, তবে তার হিজরত হবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে তার। আর যার হিজরত হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে, তবে তাঁর হিজরত হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলেরই জন্য। [৭০]

ii. গুনাহ থেকে বিরত থাকা

সন্তান গর্ভে আসার সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় গুনাহ ও অনর্থক বিষয় পরিহার করা। যেমন: নাটক-সিরিয়াল দেখা বর্জন করা, কণ্ঠস্বর সংযত রাখা, বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ঘর হতে বের না হওয়া। গায়রে মাহরাম আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের কিংবা পর্দা লঙ্ঘনের জন্য অনুমতি না দেওয়া। এভাবে চলতে পারলে পবিত্র কোরআনের সুসংবাদ গ্রহণ করুন, আল্লাহ বলছেন, 'ইন্না মাআল উসরি ইউসরা', অর্থাৎ কষ্টের সঙ্গেই আছে সুখ। [৭১] আরও বলছেন,

اِنۡ تَجۡتَنِبُوۡا کَبَآئِرَ مَا تُنۡهَوۡنَ عَنۡهُ نُکَفِّرۡ عَنۡکُمۡ سَیِّاٰتِکُمۡ وَ نُدۡخِلۡکُمۡ مُّدۡخَلًا کَرِیۡمًا ﴿۳۱﴾

'যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে; যদি তোমরা সেসব বড় গুনাহ থেকে নিজেদের বিরত রাখতে পার, তবে আমি তোমাদের (ছোট) গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেব এবং সম্মানজনক স্থানে তোমাদের প্রবেশ করাব।' [৭২]

iii. সময়মতো নামাজ আদায় করা

গর্ভকালীন সময়ে অশান্তি ও অস্থিরতা কাজ করে। কিন্তু যথাসময়ে নামাজ অন্তরকে প্রশান্ত রাখে। এজন্যই নামাজের সময় হলে রাসুল (সা.) বেলাল (রা.)-কে বলতেন, 'নামাজের ব্যবস্থা কর এবং তার মাধ্যমে আমাকে তৃপ্ত কর।' (আবু দাউদ : ৪৩৩৩) তাই গর্ভকালীন যথাসময়ে নামাজ আদায় করা চাই। গর্ভাবস্থার শেষে নামাজ পড়তে অনেক সময় অসুবিধা হয়, সেই সময়কার নামাজের মাসালা-মাসায়েল ভাল করে জেনে নেয়া উচিৎ। দুজন বিজ্ঞ মুসলমান ডাক্তার যখন থেকে রুকু সিজদা থেকে বারণ করবে, তখন থেকেই মূলত ইশারার মাধ্যমে রুকু সিজদা করা লাগবে। আর দাড়ানোতে যেহেতু গর্ভের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না, তাই প্রতি রাকাতে দাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে সময় নিয়ে দাড়াতে এবং বসা লাগলেও নামাজের ক্ষতি হবেনা। এক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে রুকু সেজদার সময় চেয়ারেও বসা যাবে। যখন আর দাড়িয়ে নামাজ পড়া সম্ভব না হবে,তখন বসে আদায় করবে। রুকু সেজদাহ ইশারার মাধ্যমে করবে। আর যদি বিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তার রুকু সেজদাহ করতে বারন না করে,তারা যদি বিষয়টাকে গর্ভের জন্য ক্ষতিকর মনে না করে,তাহলে দাঁড়িয়ে রুকু সেজদাহ সহকারেই নামাজ আদায় করতে হবে। [৭৩]

হাদীস শরীফে এসেছেঃ

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন,

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»

আমার একবার অর্শগেজ হয়ে গেলো।আমি এমন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাঃ এর নিকট নামায পড়ার পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে জিজ্ঞাসা করলাম।তখন তিনি প্রতিউত্তরে বললেন,তুমি দাড়িয়ে নামায পড়বে,তারপর দাড়ানো সম্ভব না হলে বসে বসে নামায পড়বে।যদি বসেও সম্ভব না হয় তাহলে হেলান দিয়ে নামায আদায় করবে। [৭৪]

ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়ায় বর্ণিত রয়েছে,

ولو كان قادرا على بعض القيام دون تمامه يؤمر بأن يقوم قدر ما يقدر

যদি কেউ নামাযে কিছু সময় কিয়াম করার পর অক্ষম হয়ে যায়,এবং এরপর আর দাড়াতে সক্ষম না হয়,তাহলে তার জন্য হুকুম হল যে, সে নামাযে ততটুকুই দাড়াবে যতটুকু তার জন্য সম্ভব হবে। [৭৫]

এছাড়াও উল্লেখ করা হয়,

وإن عجز عن القيام والركوع والسجود وقدر على القعود يصلي قاعدا بإيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع، كذا في فتاوى قاضي خان حتى لو سوى لم يصح، كذا في البحر الرائق.

যদি কেউ নামাযে কিয়াম,রুকু,সিজদা করতে অক্ষম থাকে,কিন্তু সে আবার বসে বসে পড়তে সক্ষম হয়,তাহলে তার জন্য হুকুম হল যে,;সে বসে বসে ইশারায় নামায পড়বে।এবং সেজদার সময় মাথাকে রুকু থেকে একটু বেশী নিচু করবে। [৭৬]তবে যদি কেউ রুকু এবং সেজদার সময়ে মাথাকে সমান করে রাখে তাহলে তার নামাযই বিশুদ্ধ হবে না। [৭৭]

আবূ হুরায়রাহ্ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ

‘পাঁচ ওয়াক্ত সলাত, এক জুমু‘আহ্ থেকে আরেক জুমু‘আহ্ এবং এক রমাযান থেকে আরেক রমাযান; এর মাঝে সংঘটিত (সগীরা) গুনাহ মুছে ফেলে, যদি কাবীরা গুনাহ থেকে সে বেঁচে থাকে তাহলে (নতুবা নয়)।’[৭৮]

অর্থাৎ কেউ যদি ফজরের সলাত আদায় করে, তারপর যোহরের সময় যোহরের সলাত আদায় করে তাহলে সে ফজরের সলাতের পর থেকে যোহরের সলাত পর্যন্ত যে সব সগীরা গুনাহ করেছে, যোহরের সলাত আদায় করার সাথে সাথে তার সেই গুনাহগুলো মাফ হয়ে যাবে। এ রকমই এক সপ্তাহে জুমু‘আহর সলাত আদায় করে পরের সপ্তাহের জুমু‘আর সলাত আদায় করলে এই দুই জুমু‘আর মধ্যবর্তী সাত দিনের সগীরা গুনাহগুলো মাফ হয়ে যাবে।

একইভাবে এ বছর যারা রমাযান মাসের সিয়াম পালন করেছে এবং পরবর্তী বছরও রযামানের সিয়াম পালন করলে তার এই দুই রমাযানের মাঝের এক বছরের সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। তবে শর্ত হচ্ছে এই সময়গুলোতে কাবীরা গুনাহ করা যাবে না।

iv. আল্লাহর জিকির করা

অস্থিরতা দূরীকরণের জন্য দরকার বেশি জিকির করা। এটা গর্ভধারিণী মা ও গর্ভের সন্তানকে শান্ত রাখতে সহায়ক হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমেই অন্তর প্রশান্ত হয়।’ [৭৯]

সকাল সন্ধার দুয়া মুমিনের জন্য দুর্গস্বরূপ। এই সময়ে সকাল সন্ধার দুয়া বিশেষ যত্নের সাথে করা দরকার। সকাল সন্ধার সময় সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত আছে।তবে সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় মত হল,তুলুয়ে ফযর থেকে নিয়ে সুর্য পূর্ব দিগন্তে উদ্ভাসিত হওয়া(প্রথম প্রহর) পর্যন্ত সকালবেলা অবশিষ্ট থাকে। অন্যদিকে কিছু সংখ্যক উলামায়ে কেরামের মতে বিকালবেলা- আছর থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। তবে কেউ কেউ রাতের এক তৃতায়াংশ পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকার কথা বলেছেন। আবার কেউ কেউ এমন মাতামতও দিয়েছেন যে, বিকালবেলার দু'আয়ে মা'ছুরাগুলো/যিকিরগুলো মূলত মাগরিবের পর থেকে শুরু করা হবে।

এ সময় প্রত্যেকের উচিৎ সকালবেলার দু'আয়ে মা'ছুরাগুলো ফযরের সুচনা থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত এর মধ্যকার সময়ের মধ্যেই পড়ে নেয়া উচিৎ।যদি কারো ছুটে যায়, তাহলে দ্বিপ্রহরের(দিন-১২টা) শেষ সীমা তথা যোহরের নামাযের কিছু পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পড়ে নেবে। আর বিকালবেলার দু'আয়ে মা'ছুরাগুলোকে আছর থেকে নিয়ে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পড়ে নেবে।তবে যদি ছুটে যায়,তাহলে রাতের প্রথম এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সময়ের ভিতরেই পড়ে নিবে। এর প্রমাণ হল,যিকির সম্পর্কে কুরআনের ঐ সমস্ত বাচনভঙ্গি ও প্রয়োগকৃত শব্দাবলী যা দ্বারা বুঝা যায় যে যিকির উপরোক্ত সময়েই পড়তে হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ

এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপনার পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করুন। [৮০]

উক্ত আয়াতে الْإِبْكَارَ দ্বারা দিনের প্রথমাংশ উদ্দেশ্য।এবং الْعَشِيِّ দ্বারা দিনের শেষাংশ উদ্দেশ্য।সুতরাং উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে,যিকিরের সময় হল,ফযরের সূচনা থেকে এবং আছরের পর থেকে।

আল্লাহ তা'আলার বানী ঃ

فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ

অতএব, তারা যা কিছু বলে, তজ্জন্যে আপনি ছবর করুন এবং, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন। [৮১]

এ আয়াতের ঐ সমস্ত হাদীসের ব্যখ্যা যেগুলোতে বর্ণিত রয়েছে যে, যে ব্যক্তি সকালবেলা এই এই দু'আ পড়বে এবং যে ব্যক্তি বিকালবেলা এই এই দু'আ পড়বে(তাকে এমন এমন প্রতিদান দেয়া হবে।)

সুতরাং উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে,হাদীসে বর্ণিত সকালবেলা দ্বারা সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়-ই উদ্দেশ্য।এবং বিকালবেলা দ্বারা সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত সময়-ই উদ্দেশ্য।

এছাড়া হাদীসে কিছু দু'আ সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি সূরা বাক্বারার শেষ দু-আয়াত রাত্রে পড়বে,সেই রাত্রের জন্য এই দু-আয়াত যথেষ্ট হয়ে যাবে। [৮২]

وَعَنْه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ ؛ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وكُتِبَتْ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِئَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي، وَلَمْ يَأتِ أَحَدٌ

بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلاَّ رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ» . وَقَالَ: «مَنْ قَالَ سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ، فِي يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَإنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ» . متفقٌ عَلَيْهِ

আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘‘লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।’

অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো সত্য উপাস্য নেই। তাঁর কোনো শরীক নেই। (বিশাল) রাজ্যের তিনিই সার্বভৌম অধিপতি। তাঁরই যাবতীয় স্তুতিমালা এবং সমস্ত বস্তুর উপর তিনি ক্ষমতাবান।

যে ব্যক্তি এই দো’আটি দিনে একশবার পড়বে, তার দশটি গোলাম আজাদ করার সমান নেকী অর্জিত হবে, একশ’টি নেকী লিপিবদ্ধ করা হবে, তার একশ’টি গুনাহ মোচন করা হবে, উক্ত দিনের সন্ধ্যা অবধি তা তার জন্য শয়তান থেকে বাঁচার রক্ষামন্ত্র হবে এবং তার চেয়ে সেদিন কেউ উত্তম কাজ করতে পারবে না। কিন্তু যদি কেউ তার চেয়ে বেশী আমল করে তবে।’’

তিনি আরও বলেছেন, ‘‘যে ব্যক্তি দিনে একশবার *’সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহ’* পড়বে তার গুনাহসমূহ মোচন করা হবে; যদিও তা সমুদ্রের ফেনা বরাবর হয়।’’ [৮৩]

উম্মু হানী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে গিয়েছি, আমাকে এমন একটি আমল শিখিয়ে দিন যা আমি বসে বসে পালন করতে পারব। তিনি বলেনঃ ‘‘তুমি ১০০ বার ‘সুব‘হা-নাল্লাহ’ বলবে, তাহলে ১০০ টি ক্রীতদাস মুক্ত করার সমপরিমাণ সাওয়াব তুমি পাবে।
তুমি ১০০ বার ‘আল হামদু লিল্লাহ’ বলবে, তাহলে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের জন্য ১০০ টি সাজানো ঘোড়ায় মুজাহিদ প্রেরণের সমপরিমাণ সাওয়াব তুমি পাবে।
তুমি ১০০ বার ‘আল্লাহু আকবার’ বলবে, তাহলে ১০০ টি মাকবুল উট কুরবানির সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে।
তুমি ১০০ বার ‘লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ বলবে, তাহলে তোমার সাওয়াবে আসমান ও জমিন পূর্ণ হয়ে যাবে [এবং তোমার কোনো পাপই বাকি থাকবে না : দ্বিতীয় বর্ণনায়]। যে ব্যক্তি তোমার এই যিকরগুলির সমপরিমাণ যিকর করবে সে ছাড়া কেউই ঐ দিনে তোমার চেয়ে বেশি বা উত্তম আমল আল্লাহর দরবারে পাঠাতে পারবে না।’’
হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে এবং সনদগুলি হাসান বা গ্রহণযোগ্য। [৮৪]

আনাস বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ ‘‘গাছের ডালে ঝাকি দিলে যেমন পাতাগুলি ঝরে যায় অনুরূপভাবে এই যিকরগুলি বললে বান্দার গোনাহ ঝরে যায়।’’ [৮৫]

আবু হুরাইরা (রাঃ) ও আবু সাঈদ (রাঃ) উভয়ে নবীয়ে আকরাম (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ ‘‘আল্লাহ এই চারটি বাক্যকে বেছে পছন্দ করে নিয়েছেন। এই বাক্যগুলির যে কোনো একটি বাক্য একবার বললে আল্লাহ ২০ টি সাওয়াব প্রদান করতেন এবং ২০ টি গোনাহ ক্ষমা করবেন। আর এভাবে যে বেশি বেশি যিকর করবে সে মুনাফিকী থেকে মুক্তি লাভ করবে।’’ [৮৬]

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ ‘নূহ (আ.) মৃত্যুর পূর্বে তাঁর পুত্রকে যে ওসীয়ত করেন তা তোমাদেরকে বলছি। তিনি বলেনঃ

آمُرُكَ بِاثْنَتَيْنِ وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ آمُرُكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَإِنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي كِفَّةٍ رَجَحَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ... وَسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ وَأَنْهَاكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ

"আমি তোমাকে দুটি কাজের নির্দেশ দিচিছ এবং দুটি কাজ থেকে নিষেধ করছি। আমি তোমাকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-এর আদেশ প্রদান করছি। কারণ সাত আসমান ও জমিন যদি এক পাল্লায় রাখা হয় এবং 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু' অন্য পাল্লায় রাখা হয় তাহলে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' ভারী হবে ... এবং আমি তোমাকে 'সুব'হা-নাল্লাহি ওয়া বি'হামদিহী'-এর নির্দেশ দিচ্ছি (অর্থাৎ, এই দুটি যিকর বেশি বেশি আদায় করতে নির্দেশ প্রদান করছি।) এই যিকর সকল সৃষ্টির দু'আ, সালাত ও তাসবীহ এবং এর ওসীলাতেই সকল সৃষ্টি রিযিক প্রাপ্ত হয়। আর আমি তোমাকে শিরক ও অহংকার থেকে নিষেধ করছি।" [৮৭] হাদিসটির সনদ হাসান।

তাই আমরা বলতে পারি, গর্ভাবস্থায় যিকিরে সার্বক্ষণিক মশগুল থাকা দুনিয়া-আখিরাত উভয়ের জন্য কল্যাণ।

v. শুকরিয়া আদায় করা

একজন সত্যিকার মুসলিম নারী গর্ভধারণের সময়টাকে বিপদ-মুসিবত মনে করে না; বরং এ কষ্ট-যাতনাকে হাসিমুখে বরণ করে নেয়। এ সময়টাতে নারী আল্লাহর বিশেষ রহমতে ডুবে থাকে। এ সময়ের ইবাদত অন্য সময়ের ইবাদতের চেয়ে অনেক দামি ও মূল্যবান। একটু চিন্তা করে দেখুন, কেবল মাতৃত্বের মাধ্যমে একজন নারী নারীজন্মের স্বার্থকতা লাভ করে। কত নারী এমন আছে, গর্ভবতী হওয়ার জন্য বছরের পর বছর ধরে চেষ্টা করছে কিন্তু তাদের ভাগ্যে এ নেয়ামত জুটছে না। এজন্য যখনি মা হওয়ার আনন্দে পুলকিত হবেন তখনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; অকৃতজ্ঞ হয়ো না।' [৮৮]

আবু তালহা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة كتب الله له مائة ألف حسنة واربعا وعشرين ألف حسنة. قالوا يا رسول الله إذا لا يهلك منا أحد قال بلى إن أحدكم ليجئ بالحسنات لو وضعت على جبل أثقلته ثم تجئ النعم فتذهب بتلك ثم يتطاول الرب بعد ذلك برحمته

"যদি কেউ ১০০ বার 'সুব'হা-নাল্লহি ওয়া বি'হামদিহী' বলে, তাহলে আল্লাহ তাঁর জন্য ১,২৪,০০০ (একলক্ষ চবিবশ হাজার) সাওয়াব লিখবেন। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, তাহলে তো আমাদের কেউই বিপদে পড়বে না (জাহান্নামে কাউকেই যেতে হবে না।) তিনি বলেনঃ হ্যাঁ। তোমাদের অনেকেই এত বেশি সাওয়াব নিয়ে কিয়ামতের দিন হাজির হবে যে, পাহাড়ের উপরে দিলেও পাহাড় ভেঙ্গে যাবে, কিন্তু এরপর আল্লাহ তাঁকে যে নিয়ামত দিয়েছিলেন তা এসে সব সাওয়াব নিয়ে চলে যাবে। এরপর মহাপ্রভু রহমত নিয়ে এগিয়ে আসবেন।" হাদীসটি সহীহ। [৮৯]

এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, যার উপর আল্লাহর নিয়ামত যত বেশি তার তত বেশি সাওয়াবের কাজ করা প্রয়োজন। আল্লাহ আমাদেরকে নিয়ামতের শুকরিয়া প্রকাশের তাওফিক প্রদান করুন এবং সকল অবহেলা ও পাপ ক্ষমা করে দিন।

প্রতিটি মানুষের জীবনে আল্লাহর অসংখ্য সাধারণ ও বিশেষ নিয়ামত রয়েছে, যা তার জীবনকে ধন্য করেছে। এর পাশাপাশি প্রত্যেকের জীবনেই কিছু কষ্ট, বেদনা ও সমস্যা আছে। যেগুলি আল্লাহর অগণিত নিয়ামতের তুলনায় অতি নগণ্য। কিন্তু সাধারণত মানবীয় দুর্বলতার কারণে আমরা এসকল কষ্ট ও বেদনার অনুভূতি দ্বারা বেশি প্রভাবিত হই। শত নিয়ামতের বিপরীতে দুই চারিটি কষ্ট আমাদের পুরো মনকে ব্যথিত করে তোলে। ব্যর্থতা, কষ্ট, বেদনা, ক্রোধ ইত্যাদি অনুভূতি আমরা লালন করি। এসকল অনুভূতির স্থায়িত্ব আমাদের মনকে কলুষিত ও অপবিত্র করে, মানসিক শক্তি ও প্রেরণাকে ব্যহত করে, আমাদের কর্মস্পৃহা নষ্ট করে, আমাদের জীবনকে গ্লানিময় করে এবং সর্বোপরি আল্লাহর রহমত ও অফুরন্ত নিয়ামত লাভের পথ থেকে আমাদের দূরে নিয়ে যায়।

আল্লাহর বান্দা আল্লাহকে যেভাবে মনে করবে, সেভাবেই তাঁকে তার পাশে পাবে। জীবনের প্রতি না-বোধক অনুভূতি আল্লাহর রহমত থেকে বান্দাকে নিরাশ করে, যা কঠিনতম পাপ ও অবিশ্বাস। অপরদিকে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে আল্লাহ নিয়ামত বাড়িয়ে দেন। এজন্য মুমিনকে নিজের মন কৃতজ্ঞতা দিয়ে আবাদ করতে হবে। সকল কষ্ট, বেদনা, ব্যর্থতা ও উৎকণ্ঠা থেকে মনকে সাফ করে আল্লাহর অশেষ নিয়ামতের কথা স্মরণ করে এগুলির জন্য কৃতজ্ঞতার অনুভূতি দিয়ে হৃদয়কে ভরতে হবে। আর অবিরত সকৃতজ্ঞ চিত্তে বলতে হবেঃ ‘আল-হামদু লিল্লাহ।’ এই যিকর যাকিরের মনকে ভারমুক্ত করবে, গ্লানিমুক্ত করবে, শক্তিশালী করবে এবং আল্লাহর রহমত, নিয়ামত ও বরকত তাঁর জীবন ভরে তুলবে। [৯০]

vi. অজু অবস্থায় থাকা

দৈহিক সুস্থতা ও আত্মিক প্রশান্তির ক্ষেত্রে অজুর ভূমিকা অপরিসীম। বিশেষত ঘুমানোর আগে অজু করে নেওয়া। এতে অনিদ্রার বিড়ম্বনা থেকে বাঁচা সহজ হবে। রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন নামাজের অজুর মতো অজু করবে।’ [৯১]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُه صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذٰلِكَ الدَّهْرَ كُلَّه

‘‘যে ব্যক্তি ফরয সলাত উপস্থিত হলে সে জন্য উত্তমরূপে উযূ করবে। (অতঃপর) তাতে উত্তমরূপে ভক্তি-বিনয়-নম্রতা প্রদর্শন করবে এবং উত্তমরূপে ‘রুকূ‘’ করবে। তাহলে তার সলাত পূর্বে সংঘটিত কাবীরা গুনাহ ছাড়া অন্যান্য পাপরাশির জন্য কাফফারা বা মাফের অবলম্বন হয়ে যাবে। আর এ বিধান সর্বযুগের জন্য প্রযোজ্য।’’[৯২]

মূলত সালাতের জন্যই ওযু করা হয়। বিশেষ করে ওযুর পরেই দুই রাক’আত সালাতের গুরুত্ব হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন হাদীসে কষ্ট হলেও সুন্দর ও পরিপূর্ণরূপে সুন্নাতের পূর্ণ অনুসরণ করে ওযু করার বিশেষ ফযীলত ও সাওয়াব

বর্ণিত হয়েছে। এরপর যখন মুমিন সালাত পড়েন তখন তার গোনাহ ক্ষমা করা হয়। উকবা ইবনু আমির (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبه وَوَجْهِهِ (فيعلم ما يقول) إلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

"যে কোনো মুসলিম যদি সুন্দরভাবে ওযু করে এরপর নিজের সমগ্র মন ও মুখ সালাতের দিকে ফিরিয়ে (দেহ-মনের সমগ্র অনুভূতি কেন্দ্রীভূত করে) এবং এভাবে সালাতে কী পাঠ করছে তা জেনে বুঝে দুই রাক'আত সালাত আদায় করে, তার সকল গোনাহ এমনভাবে ক্ষমা করা হয় যে, সে নবজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যায়।" [৯৩]

vii. আযান শেষে নিজের জন্য প্রার্থনা করা

এক হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لا تَنْبَغِي إِلا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ

"যখন তোমরা মুয়াযযিনকে আযান দিতে শুনবে, তখন সে যেরূপ বলে তদ্রূপ বলবে। এরপর আমার উপর সালাত পাঠ করবে ; কারণ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার সালাত পাঠ করবে, আল্লাহ তাঁকে দশবার সালাত (রহমত) প্রদান করবেন। এরপর আমার জন্য 'ওসীলা' চাইবে ; কারণ 'ওসীলা' জান্নাতের সর্বোচচ স্থান, আল্লাহর একজন মাত্র বান্দাই এই মর্যাদা লাভ করবেন এবং আমি আশা করি আমিই হব সেই বান্দা। যে ব্যক্তি আমার জন্য 'ওসীলা' প্রার্থনা করবে, তাঁর জন্য শাফায়াত প্রাপ্য হয়ে যাবে।" [৯৪]

রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে আযান সংশিলষ্ট যিকর শেষ করে নিজেদের পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে শিক্ষা দিয়েছেন। এই সময়ের প্রার্থনা আল্লাহ কবুল করেন বলে তিনি জানিয়েছেন। গর্ভকালীন সময়ে এই আমল হতে পারে অন্যতম সহজ একটি আমল।

viii. কোরআন তেলাওয়াত করা

গর্ভস্থ সন্তান আনুমানিক ২০তম সপ্তাহের পর কোনো কিছু শোনার সক্ষমতা অর্জন করে। মা প্রতিদিন কিছু সময় কোরআন তেলাওয়াত করে বাচ্চা ও কোরআনের মাঝে সম্পর্ক জুড়ে দেওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন, عَلَيْكُم بِالْقُرْآن ، فَتَعَلَّمُوه وَعَلِّمُوه أَبْنَائِكُم ، فَإِنَّكُم عَنْه تُسْأَلُوْن ، وَبِه تُجْزَوْن

'তোমাদের ওপর অবশ্যক হলো, তোমরা কোরআন শিক্ষাগ্রহণ করবে এবং তোমাদের সন্তানদের কোরআন শিক্ষা দেবে। কেননা এ বিষয়ে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে এবং তার প্রতিদানও দেওয়া হবে।' [৯৫]

কুরআন তেলাওয়াত করা, অর্থ বুঝা, অনুভব করা, শানে নুযূল সহ তাফসীর বুঝে বুঝে পরা এবং আয়াতগুলো নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করা এ সময়ের অতি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

সন্তান গর্ভে থাকাকালীন মায়েদের উচিত বেশি বেশি পবিত্র কোরআনুল কারীম তিলাওয়াত করা ও ধর্মীয় বই পড়া।

বুজুর্গ ব্যক্তিবর্গ কিছু আমল ও তার ফযিলতের কথা বলেছেন। যেমনঃ

সন্তান গর্ভে ধারণের ১ম, ২য় ও ৩য় মাসে গর্ভবতী মহিলা সূরা লোকমান ও সূরা ইনশিক্বাক পড়ুন। ৪র্থ , ৫ম ও ৬ষ্ঠ মাসে সূরা ইউসুফ ও আল ইমরান পড়ুন। আর ৭ম, ৮ম ও ৯ম মাসে সূরা মারইয়াম ও সূরা মুহাম্মাদ পড়ুন।

সূরা লোকমান পড়লে গর্ভের সন্তান জ্ঞানী, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও হেকমত ওয়ালা হয়।

সূরা ইনশিক্বাক পড়লে গর্ভের সন্তান সকল প্রকার ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকে।

সূরা ইউসুফ পড়লে গর্ভের সন্তানের রুহানী ও জিসমানী উভয় দিক সুন্দর হয়।

সূরা আল ইমরান পড়লে গর্ভের সন্তান দ্বীনের পথে আহবানকারী হয়।

সূরা মারইয়াম পড়লে গর্ভের সন্তান পরহেজগার ও আল্লাহ ভীরু হয়।

সূরা মুহাম্মাদ পড়লে গর্ভের সন্তান সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হয়।

আরও নির্দিষ্ট ভাবে বলা হয়েছে,

প্রথম মাসে সূরা-আল ইমরান পড়লে সন্তান দামী হবে।

দ্বিতীয় মাসে সূরা-ইউসুফ পড়লে সন্তান সুন্দর হবে।

তৃতীয় মাসে সূরা মারিয়াম পড়লে সন্তান সবর কারী হবে।

চতুর্থ মাসে সূরা-লোকমান পড়লে সন্তান হেকমত ওয়ালা হবে।

পন্চম মাসে সূরা-মুহাম্মদ পড়লে সন্তান চরিত্র বান হবে।

ছষ্ঠ মাসে সূরা-ইয়াসিন পড়লে সন্তান জ্ঞানী হবে।

সপ্তম,অষ্ঠম,নবম এবং দ্বশম মাসে সূরা-ইউসুফ,মুহাম্মদ এবং ইব্রারাহিম এর প্রথম থেকে দশ আয়াত পড়বে।

ব্যাথা উঠলে সূরা-ইনশিকক পড়ে পানিতে ফুক দিয়ে পান করবে। [৯৬]

অবশ্য অনেক আলেমগন এভাবে মাস ভিত্তিক কুরআন পাঠ বিদাত হিসেবে মনে করেছেন। তবে পূর্ববর্তী কিছু নেককার বান্দাগণ(সালাফে সালেহীন) তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু সংখ্যার পরামর্শ দেন বা পদ্ধতির পরামর্শ দেন,সেগুলোকে জরুরী বা সুন্নত মনে না করে আ'মলে নেয়া যেতে পারে।তবে এক্ষেত্রে এমন মনোভাব রাখতে হবে যে,উক্ত সংখ্যা বা পদ্ধতি আমাদের উদ্দেশ্য নয় বরং আমাদের উদ্দেশ্য হল, বেশী বেশী করে পড়া।কিন্তু কতটুকু পড়ালে বেশী হবে?সেটা তো আমাদের জানা নেই।তাই নেককার বান্দাদের পরামর্শকৃত একটা সংখ্যা বা পদ্ধতিকে

আপাতত আমরা বেশীর মানদন্ড হিসেবে ধরে নিচ্ছি।এবং সাথে সাথে নিজেকে খালিছভাবে আল্লাহর সামনে উপস্থাপন করছি।হয়তো এই বেশী পড়ার মনোভাব থাকায় আল্লাহ আমাদের দু'আ কে কবুল করে নিতে পারেন।

যারা না বুঝে কুরআন পড়ে এবং কুরআনের উপর আমল করে না, তারাই তার প্রতি অন্ধ ও বধির সদৃশ আচরণ করে।

সালাফে সালেহীনগণের অভ্যাস ছিল কুরআন বুঝে পড়ে তার নির্দেশ অনুযায়ী আমল করা। আবু আব্দুর রহমান সুলামী (রঃ) বলেন, 'আমাদেরকে আমাদের ওস্তাদগণ বর্ণনা করেছেন যে, যাঁরা রসূল (ﷺ) এর ছাত্র ছিলেন তাঁরা দশটি আয়াত শিখলে ততক্ষণ পর্যন্ত আর আগে বাড়তেন না যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ দশ আয়াতের বর্ণিত ইল্ম ও আমল শিক্ষা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, আমরা ইল্ম ও আমল উভয়ই (একই সময়ে) শিক্ষা করেছি।' [৯৭]

আল্লাহর কিতাব বুঝে পড়তে হয় বলেই তাড়াহুড়া করে তা খতম করা বিধেয় নয়। রাসুল (ﷺ) বলেন, ''সে ব্যক্তি কুরআন বুঝে না, যে তিন দিনের কম সময়ে তা খতম করে।'' [৯৮]

ix. ইস্তেগফার ও দুরুদ পাঠ

ইস্তেগফার বেশি বেশি পড়ার মধ্যে অনেক ফজিলত আছে। বিপদ-আপদ থেকে সুরক্ষার পাশাপাশি রিযিকের বরকত পাওয়া যায় ইস্তেগফার এবং দুরুদ পাঠের আমলে। আবূ হুরাইরাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর কসম! আমি প্রত্যহ ৭০ বারের অধিক আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা ও তওবা করি। [৯৯]

ইস্তিগফারের কিছু ইতিবাচক প্রভাব আছে। যেমন প্রতিদিন ১০০ বার ইস্তিগফার পড়লে মন-মস্তিষ্কে তার বিশেষ প্রভাব পড়ে। কারণ বারবার উচ্চারিত কথা মনে-ব্রেনের নির্দিষ্ট জায়গায় স্থান করে নেয় এবং সেই অনুযায়ী মানুষের চরিত্র ও আচরণে বিশেষ প্রভাব পড়ে। সুতরাং পাপ থেকে বারবার ক্ষমা চাইলে পাপ করার প্রবণতা ধীরে ধীরে কমে যায়।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ আযযা অজাল্ল বলেন, 'আমি সেইরূপ, যেরূপ বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি তার সাথে থাকি, যখন যে আমাকে স্মরণ করে। আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার তওবায় তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বেশি খুশী হন, যে তার মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়া বাহন ফিরে পায়। আর যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হই। যে আমার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দুই হাত পরিমাণ অগ্রসর হই। আর সে যখন আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয়, আমি তখন তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই। [১০০]

ইস্তিগফারের সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো, প্রথমে আল্লাহর মহান সত্তা ও গুণাবলীর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা; এরপর (লজ্জিত ও অনুশোচিত হয়ে) নিজের গুনাহের স্বীকারোক্তি প্রদান করা এবং সর্বশেষ আল্লাহর কাছে মাগফিরাত তথা ক্ষমার ফরিয়াদ করা। [১০১]

এই তিনটি মূলনীতির প্রমাণ হলো সায়্যিদুল ইস্তিগফারের বাক্যগুলো। সেখানে এই তিনটিই আছে। আর, এটিকে হাদিসেই বলা হয়েছে, সব ইস্তিগফারের নেতা (সায়্যিদুল ইস্তিগফার)।

সায়্যিদুল ইস্তিগফার:

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

.

[আল্লা-হুম্মা আনতা রব্বি লা-ইলাহা ইল্লা আনতা খালাক্বতানি ওয়া আনা ‘আবদুক, ওয়া আনা ‘আলা ‘আহিদকা ওয়া ওয়া’দিকা মাসতা ত’তু, আ‘উ-যুবিকা মিন শাররি মা সনা’তু, আবু-উ লাকা বিনি’মাতিকা ‘আলাইয়া, ওয়া আবু-উ বিযানবি, ফাগফিরলি ফা ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনু-বা ইল্লা আনতা]

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনিই আমার রব। আপনি ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই। আপনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন আর আমি আপনারই বান্দা। আপনি আমার কাছ থেকে যে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন, সাধ্যানুযায়ী আমি তার ওপর চলবো। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই। আপনি আমার প্রতি আপনার যে নিয়ামত দিয়েছেন, তা আমি স্বীকার করছি এবং আমার গুনাহের কথাও স্বীকার করছি। অতএব, আপনি আমাকে মাফ করে দিন। কারন আপনি ব্যতীত কেউ গুনাহ মাফ করতে পারে না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘যে ব্যক্তি দিনের বেলায় এটি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে পড়বে, অতঃপর সেদিন সন্ধ্যা হওয়ার আগেই মারা যাবে, সে জান্নাতিদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর, যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে এটি পড়বে, অতঃপর সকাল হওয়ার আগেই মারা যাবে, সেও জান্নাতিদের অন্তর্ভুক্ত হবে।’’ [১০২]

খেয়াল করে দেখুন, দু‘আটিতে প্রথমে আছে আল্লাহর প্রশংসা, এরপর নিজ ভুলের স্বীকৃতি এবং সবশেষে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা। ইমাম ইবনু রজব রাহিমাহুল্লাহর মতে, এটি হলো ইস্তিগফারের সর্বোত্তম পদ্ধতি। তবে, ইস্তিগফারের সব বাক্যে এই পদ্ধতিটি অনুসৃত হয়নি। অতএব, হুবহু এই নিয়মে সবসময় ইস্তিগফার করা জরুরি নয়। বরং ইস্তিগফারের যেকোনো বাক্য দিয়েই ইস্তিগফার করা যায়। হোক সেটি কুরআনে বর্ণিত কোনো দু‘আ বা হাদিসের কোনো দু‘আ। এমনকি নিজের মতো করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েও ইস্তিগফার করা যাবে।

দুরুদ বেশি বেশি পাঠকারীদের জন্য আছে রাসুল (সাঃ) এর শাফায়েতের প্রতিশ্রুতি। ’আব্দুল্লাহ ইবনে ’আমর ’আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, “যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার দরুন তার উপর দশবার দুরুদ পাঠ করবেন।” [১০৩]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা তাঁর মহান রাসূল (সা.)-কেও মুমিনদের জন্য ‘সালাত’ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছেঃ

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“(হে রাসূল) আপনি তাঁদের (মুমিনদের) সম্পদ থেকে দান (যাকাত) গ্রহণ করুন, যা তাঁদেরকে পবিত্রতা, বরকত ও বৃদ্ধি প্রদান করবে এবং আপনি তাঁদের উপর ‘সালাত’ দান করুন (তাঁদের কল্যাণ, বরকত ও ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য দু’আ

করুন)। নিশ্চয় আপনার ‘সালাত’ তাঁদের জন্য রহমত, শান্তি ও তৃপ্তি। [১০৪] আল্লাহ সবকিছু শোনেন এবং সবকিছু জানেন।” [১০৫]

সর্বোপরি, মহান আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতাগণ মহানবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর উপর সালাত প্রদান করেন আর বিশ্বাসীদের দায়িত্ব তাঁর (নবীর) উপর সালাত ও সালাম প্রেরণ করা। আল্লাহ ইরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

“নিশ্চয় আল্লাহ এবং তাঁর ফিরিশতাগণ নবীর উপর ‘সালাত’ প্রদান করেন (আল্লাহ তাঁর মহান নবীকে রহমত করেন, সর্বোত্তম মর্যাদা প্রদান করেন, বরকত দান করেন, তাঁর সুপ্রশংসা ও মর্যাদা বিশ্বাবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে দেন, আর ফিরিশতাগণ তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন) (১০৬)। হে বিশ্বসীগণ, তোমরা তাঁর উপর ‘সালাত’ ও ‘সালাম’ প্রেরণ কর।” [১০৭]

x. সালাতুদ-দুহার আমল

সালাতুদ-দুহা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে তা পালন করেছেন এবং সাহাবীগণকে তা পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। [১০৮]

রাসূল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى»

“তোমাদের শরীরের প্রতিটি হাড় ও জোড়া সদকা করার দাবি নিয়ে সকালে উপনীত হয়। তোমাদের প্রতিটি তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ বলা) সদকা, প্রতিটি তাহমীদ (আল-হামদুলিল্লাহ বলা) সদকা, প্রতি তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা) সাদকা এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা সাদকা। আর দুই রাকাত সালাতুত-দুহা আদায় করা উল্লিখিত সব কর্মের সমান হবে”। [১০৯]

এই রকম সুন্নাহ আমল সুযোগ মত আমল করা চাই। হাদিসে এসেছে,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَقُولُ " مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ النَّاسِ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِ النَّاسِ شَيْئًا وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً لاَ يَرْضَاهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِثْلَ إِثْمِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ النَّاسِ لاَ يَنْقُصُ مِنْ آثَامِ النَّاسِ شَيْئًا " .

কাসীর ইবনু আবদুল্লাহ (রহঃ) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যাক্তি আমার (মৃত্যুর) পরে বিলুপ্ত হওয়া আমার কোন সুন্নাত জীবিত

করলো, সে তদনুযায়ী আমলকারীদের সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে এবং তাতে আমলকারীদের সাওয়াবের সামান্যও হ্রাস পাবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যাক্তি এমন কোন বিদআতের প্রচলন করলো, যার প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সন্তুষ্ট নন, তার উপর বিদআত অনুসরণকারীদের সমপরিমাণ গুনাহ বর্তাবে এবং তাতে অনুসরণকারীদের পাপের পরিমাণ কিছুই হ্রাস পাবে না। [১১০]

xi. মানসিকভাবে প্রফুল্ল থাকা

এ সময়ে মনের প্রফুল্লতা বজায় রাখার জন্য নিজের যত্ন নেয়া জরুরী। নতুন কোন কিছু শেখা যেতে পারে, চাই সেটা নতুন কোন রান্না বা সেলাই বা বাগান করা। স্বামীকে নিয়ে বসে ইসলামিক parenting বা child development এর বই পড়া অথবা কোথাও বেড়াতে যাওয়া যেতে পারে। খোলা বাতাসে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহন করা, সবুজ ঘাসে খালি পায়ে হাঁটা এবং আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতরাজি স্মরণ করার মাধ্যমে মানসিক শান্তি অর্জন করা সম্ভব। অভিজ্ঞ কার সাথে আলাপ করা এবং সমমনার মানুষদের সাথে মেলামেশা করাও এ সময়ের মানসিক শান্তির জন্য দরকার। বেশি রাত পর্যন্ত জাগ্রত থাকা থেকে বিরত থাকুন। গর্ভাবস্থায় রাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুম না হলে স্বাস্থ্যহানী ঘটে। তাই ইশার নামাজ সময়ের শুরুতে পড়ে নিন। তারপর প্রয়োজনীয় কাজ সেরে যত দ্রুত সম্ভব ঘুমিয়ে পড়ুন। দেরি করে ঘুমোতে যাবেন না। অন্তত এতটা আগে রাতের বিছানায় যেতে হবে যাতে করে কমপক্ষে ছয় ঘন্টা ঘুম নিশ্চিন্তে যাওয়া যায় এবং ফজর যথাসময় পড়া যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا আর আমি তোমাদের নিদ্রাকে করেছি ক্লান্তি দূরকারী। [১২৬]

xii. ভাল খাবার গ্রহন ও শারীরিক ব্যায়াম

হালাল এবং তয়্যেব খাবার যেন এ সময়ে খাওয়া হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্রসেস করা খাবার থেকে যথা সম্ভব দূরে থাকতে হবে। তাজা খাবার আর সুন্নাহ সম্মত খাবারে রয়েছে কল্যাণ। তাই এ সময়ে খাবারে মাছ, মধু, তীন ফল, জয়তুন তেল, বার্লি, কালজিরা,খেজুর অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। বিশেষ করে গর্ভের শেষ দিকে খেজুর খাওয়া শরীরের জন্য ভাল। মারইয়াম (আঃ) এর সন্তান প্রসবের সময় খেজুর খাবার উপদেশ দেয়া হয়েছিল।

وَ هُزِّیۡۤ اِلَیۡکِ بِجِذۡعِ النَّخۡلَۃِ تُسٰقِطۡ عَلَیۡکِ رُطَبًا جَنِیًّا ﴿۲۵﴾

'আর তুমি খেজুর গাছের কান্ড ধরে তোমার দিকে নাড়া দাও, তাহলে তা তোমার উপর তাজা-পাকা খেজুর ফেলবে'। [১১১]

গর্ভকালীন সময়ে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী শারীরিক ব্যায়াম করা উচিত, যাতে শক্তি সামর্থ্য বজায় থাকে। কোন ভাল ইসলামিক লেকচার অথবা জিকির করতে করতে বা কুরআন শুনতে শুনতে আধা ঘন্টা হেঁটে ফেলা যায় খুব সহজেই। ব্যাপারটা অনেকটা এক ঢিলে দুই পাখির মত। গর্ভকালীন সময়ে শারীরিক ভাবে ফিট থাকলে তা প্রসবকালীন সময়ে সহায়ক হয়। প্রসব পরবর্তী সুস্থতা দ্রুত হয়। আর এ ক্ষেত্রে টনিক হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা দুর্বল মুসলিম থেকে শক্তিশালী মুসলিম পছন্দ করেন। তবে শারীরিক অবস্থার আওতার বাইরে কোন কাজ করা এ সময়ে ঠিক হবেনা। মধ্যপন্থা অবলম্বন করা এ ক্ষেত্রে বেশি জরুরী।

xiii. বেশি বেশি দুয়া করা

গর্ভকালীন সময়ে মাঝে মাঝে অসহায়বোধ হয়। এমনও মনে হয়, না-জানি এবার আমি মরে যাব কি না! তাই গর্ভকালীন অধিক পরিমাণে আল্লাহর কাছে দোয়া করা। কেননা এ সময়ের দোয়া আল্লাহ কবুল করেন। আল্লাহ নিজেই বলেছেন, ‘বল তো কে অসহায়ের ডাকে সাড়া দেন, যখন কেউ ডাকে এবং কষ্ট দূর করে দেন?’ [১১২] সুতরাং নেক, সুস্থ ও সুন্দর সন্তান কামনা করে বারবার দোয়া করা। এ সময়ের ফায়েদা নেয়ার জন্য বেশির ভাগ সময় দুয়া করে কাটিয়ে দেয়া উচিত। এই দুয়া যে কোন বিষয়ে হতে পারে। ভাল ডাক্তার, হসপিটালের দুয়া থেকে শুরু করে যে কোন প্রয়োজন এই সময় দুয়ার মাধ্যমে চেয়ে নিতে হবে। হিসনুল মুসলিম কিতাব থেকে সুন্নাহ সম্মত দুয়াগুলো পড়া যেতে পারে। কোরআনে বর্ণিত দোয়াগুলো বেশি বেশি মুখে উচ্চারণ করা উচিত।

যেমন- رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ

রব্বি হাবলি মিন লাদুনকা জুররিয়াতান তাইয়িবাহ, ইন্নাকা আনতাস সামিউদ দোয়া’, অর্থাৎ, ‘হে রব! আপনার পক্ষ থেকে আমাকে পুতঃপবিত্র সন্তান দান করুন। নিশ্চয় আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী।’ [১১৩] নেক সন্তান কামনায় এ দোয়া পড়া- رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ

‘রব্বি হাবলি মিনাস সলিহিন’, অর্থাৎ, ‘হে রব! আপনি আমাকে সৎকর্মশীল পুত্র সন্তান দান করুন।’ [১১৪]

সুরা আলে ইমরানে আমরা দেখি যে, ইমরানের স্ত্রী গর্ভবতী অবস্থায় আল্লাহ সুবহানাহুতা’আলার নিকট একটি বিশেষ দুয়া করেছিলেন। এই দুয়াটি সুরা আলে ইমরানের ৩৬ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। মারিয়াম (আ.)-এর মায়ের এ দোয়ার মাহাত্ম্য জানার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, এ দোয়ার ফলে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে মারিয়াম (আ.)-এর মতো এমন রত্নগর্ভা কন্যা সন্তান দিয়েছেন যিনি পৃথিবীবাসীকে উপহার দিয়েছেন নবী ঈসাকে (আ.)। এ জন্য গর্ভবতী মায়েদের উচিত এ দোয়াটি গুরুত্বসহকারে পড়া যেন আল্লাহ তায়ালা তাকেও নেককার পরহেজগার সুসন্তান দান করেন।

এছাড়াও আর কিছু আয়াত অন্তর প্রশান্তিমুলক দুয়া হিসেবে পড়া উচিত। যেমনঃ

﴿وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ أَزۡوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعۡيُنٖ وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِينَ إِمَامًا ٧٤﴾ [الفرقان: ٧٤]

“যারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শস্বরূপ কর”। [১১৫]

﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلۡكِبَرِ إِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ٣٩ رَبِّ ٱجۡعَلۡنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلۡ دُعَآءِ ٤٠ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ يَوۡمَ يَقُومُ ٱلۡحِسَابُ ٤١﴾ [ابراهيم: ٣٩، ٤١]

“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি আমাদের বার্ধক্য বয়সে ইসমাইল ও ইসহাককে দান করেছেন। নিশ্চয় আমার রব দো‘আ শ্রবণ করেন। হে আমার রব! আমাকে সালাত কায়েমকারী করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্যে থেকেও।

হে আমার রব! কবুল করুন আমাদের দো‘আ। হে আমাদের রব আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মুমিনকে ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাব কায়েম হবে”। [১১৬]

وَ زَكَرِيَّآ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّ اَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿۸۹ۚ﴾

আর স্মরণ কর যাকারিয়্যার কথা, যখন সে তার রবকে আহবান করে বলেছিল, ‘হে আমার রব! আমাকে একা রেখো না, তুমি তো শ্রেষ্ঠ মালিকানার অধিকারী’। (১১৭)

শায়খ ইবনু উছাইমীন রহ. বলেন, ‘গর্ভবতীর সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে কষ্টের সময় এসমস্ত আয়াত পড়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ অনেকের উপকার দান করেছেন।

এই আয়াতগুলো পাঠ করে মহিলার উপর ফুঁক দিবে: ১) সূরা রা‘দের ৮নং আয়াত ২) সূরা ফাতির ১১ নং আয়াত ৩) সূরা নাহাল ৮৭নং আয়াত এবং ৪) সূরা যিলযাল।

একজন মহিলা এআয়াতগুলো পাঠ করে সন্তান প্রসবীনীর উপর ফুঁক দিবে। অথবা যে কোন লোক তা পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিবে। তারপর সে পানি গর্ভবতীকে পান করাবে এবং তা দিয়ে তার পেট মালিশ করবে।’

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসে ইরশাদ করেন, ‘আল্লাহ তাআলার ৯৯টি গুণবাচক নাম রয়েছে; যে ব্যক্তি এ গুণবাচক নামগুলোর জিকির করবে; সে জান্নাতে যাবে।’ আল্লাহ তাআলার এ গুণবাচক নামগুলোর দৈনন্দিন জীবনে পালনীয় আলাদা আলাদা আমল এবং অনেক ফজিলত ও উপকারিতা রয়েছে।

আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নাম সমূহের মধ্যে (اَلْمُبْدِئُ) ‘আল-মুবদিয়ু’ একটি। এ পবিত্র নামের আমলের মাধ্যমে গর্ভের সন্তানের হেফাজত এবং সহজে নিরাপদে নারীদের সন্তান প্রসব হয়। [১১৮]

কিছু দু'আ র বেলায় হাদীসে সংখ্যার উল্লেখ রয়েছে।সুতরাং সেগুলোকে উক্ত সংখ্যায় পড়াই সুন্নাত।অন্যদিকে কিছু দু'আ এমন রয়েছে যেগুলোতে সংখ্যার উল্লেখ আসেনি।সুতরাং সেগুলো কে বিশেষ কোনো সংখ্যা দ্বারা আখ্যায়িত করা,বা উক্ত সংখ্যার সাথে জরুরী মনে করা ঠিক হবে না।এমনকি বাড়াবাড়ি করলে বেদ'আত পর্যন্ত হুকুম আসবে।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পিছনে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেনঃ

يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ

“হে বালক, আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দিচ্ছি। তুমি আল্লাহকে (তাঁর বিধানাবলীকে) হেফাযত করবে, তাহলে তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহকে (তোমার অন্তরে সদা জাগরুক ও) সংরক্ষিত রাখবে, তাহলে তাঁকে সর্বদা তোমার সামনে পাবে। যখন চাইবে বা প্রার্থনা করবে তখন শুধু আল্লাহর কাছেই চাইবে। যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন শুধু আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। জেনে রাখ, যদি সকল মানুষ তোমার কোনো কল্যাণ করতে সম্মিলিত হয়, তাহলে তারা তোমার শুধুমাত্র ততটুকুই কল্যাণ করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন। আর যদি তারা সবাই তোমার অকল্যাণ করতে একজোট হয়, তাহলে তারা তোমার শুধুমাত্র ততটুকুই

অকল্যাণ করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার বিরুদ্ধে নির্ধারণ করেছেন। কলমগুলি উঠে গেছে এবং পৃষ্ঠাগুলি শুকিয়ে গিয়েছে।" হাদীসটি সহীহ। [১১৯]

সাধারণ বিপদ-আপদ, কষ্ট-দুঃখ বা সমস্যার কথা আমরা অনেক সময় অন্য কোনো মানুষকে বলে সহযোগিতা কামনা করি বা অন্তত মনকে হাল্কা করি। কিন্তু প্রকৃত মুমিনের অভ্যাস যে, সে কোনো বান্দার কাছে কোনো ব্যথার কথা না বলে তার সকল ব্যথা, বেদনা, কষ্ট ও যাতনার কথা তাঁর মালিকের কাছে পেশ করা। একমাত্র তিনিই তো তা দূর করতে পারেন। আর তিনি না করলে তো কারো কিছু করার নেই। শতবার ফিরিয়ে দিলেও একমাত্র তাঁর দরজাই মুমিনের গন্তব্যস্থল। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেনঃ

مَنْ نَزَلَتْ به فَاقَة فأنزلها بالناس لم تُسَدَّ فاقَتُه ومَنْ نزلتْ به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له بِرِزْقِ عاجِل أو آجِل

"যদি কোনো ব্যক্তি কষ্ট-অভাবে পতিত হয়ে তার অভাবে কথা মানুষের কাছে পেশ করে বা মানুষকে বলে তাহলে তার অভাব মিটবে না। আর যদি সে তার বিপদ বা অভাব আল্লাহর নিকট পেশ করে তাহলে অচিরেই আল্লাহ তাকে নিকটবর্তী বা দূরবতী রিযক প্রদান করবেন।" হাদীসটি সহীহ। [১২০]

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ (সা.) জাগতিক ও ধর্মীয় সকল কাজে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়েও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি জুতার ফিতা ছিড়ে গেলেও তা আল্লাহর কাছে চাইতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। লবণের দরকার হলেও আল্লাহর কাছে চাইতে হবে।

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلَهُ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ وَحَتَّى يَسْأَلَهُ الملح

"তোমরা তোমাদের সকল প্রয়োজন আল্লাহর কাছে চাইবে, এমনকি যদি জুতার ফিতা ছিড়ে যায় তাহলে তাও তাঁর কাছেই চাইবে। এমনকি লবণও তাঁর কাছেই চাইবে।" [১২১]

আয়েশা (রাঃ) বলেন:

سَلُوا اللَّهَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الشِّسْعَ فَإِنَّ اللَّهَ إِنْ لَمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ

"তোমরা সবকিছু আল্লাহর কাছে চাইবে। এমনকি জুতার ফিতাও আল্লাহর কাছে চাইবে। কারণ আল্লাহ ব্যবস্থা না করলে জুতার ফিতাও মিলবে না।" হাদীসটির সনদ সহীহ। [১২২]

xiv. ধৈর্য্য ধারণ

মা হতে যাওয়া নারীকে ধৈর্য ও অল্পেতুষ্টির পরিচয় দিতে হবে। যেসব খারাপ অভ্যাস মানুষের জীবনকে নিকৃষ্ট বানিয়ে ফেলে যেমন হিংসা-বিদ্বেষ, অহঙ্কার, আত্মগরিমা ও মিথ্যা এসব থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা। অনর্থক অপ্রয়োজনীয়

কাজ পরিহার করা। অত্যধিক প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না যাওয়া। সব সময় ইবাদতে জড়িয়ে থাকা। এসব কাজে পেটে ধারণ করা অনাগত সন্তানও অংশগ্রহণ করে আর আল্লাহর সামনে মায়ের প্রত্যেকটা আমলের সাক্ষীও হবে সে।

বিপদের সময় ধৈর্য্য ধারণ করা বিষয়ে কোনো আরবী কবি বলেছেন 'বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ করা খুবই কঠিন, কিন্তু এর শেষ পরিণাম খুবই সুমধুর।' কেননা এ সবর করাটা তার নিকট খুবই কঠিন তবুও সে সবর করে। বিপদগ্রস্ত হওয়াটা যেমন অপছন্দ করে তেমনি তাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করাটাও তার নিকট অপছন্দনীয়। কিন্তু তার ঈমান তাকে অসন্তুষ্টি প্রকাশ থেকে বিরত রাখে। মোটকথা সে বিপদে আপতিত হওয়া এবং না হওয়াকে এক মনে করে না। এক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করা ওয়াজিব। কারণ, আল্লাহ তায়ালা বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করার আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿وَٱصۡبِرُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾ [الانفال: ٤٦]

"তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" [১২৩]

নবীজী ﷺ চমৎকার বলেছেন, الصَّبْرُ ضِيَاءٌ সবর হল জ্যোতি। [১২৪]

xv. অসন্তুষ প্রকাশ না করাঃ

গর্ভধারণের কারনে কখনই অসন্তুষ প্রকাশ না করা উচিৎ। অসন্তুষ প্রকাশ আবার কয়েক প্রকার।

১ম প্রকার: আল্লাহ যে বিষয় নির্ধারণ করেছেন, তার কারণে অন্তর দিয়ে আল্লাহর ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া। এটা হারাম। কারণ, এধরণের অসন্তুষ্টি কখনো কুফুরীর দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعۡبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرۡفٖۖ فَإِنۡ أَصَابَهُۥ خَيۡرٌ ٱطۡمَأَنَّ بِهِۦۖ وَإِنۡ أَصَابَتۡهُ فِتۡنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجۡهِهِۦ خَسِرَ ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةَۚ﴾ [الحج: ١١]

"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধা-সংকোচ নিয়ে আল্লাহর ইবাদাত করে। যদি সে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, তবে ইবাদাতের উপর কায়েম থাকে এবং যদি কোনো পরীক্ষায় পড়ে, তবে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্থ।" [১২৫]

২য় প্রকার: কখনো অসন্তুষ্টি কথার মাধ্যমে হয়ে থাকে। যেমন, হতাশা প্রকাশ করা এবং ধ্বংস হয়ে যাওয়ার দো'আ করা। এটাও হারাম।

তৃতীয় প্রকার: কখনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে হয়ে থাকে। যেমন, গাল চাপড়ানো, জামা-কাপড় ছেড়া, মাথার চুল টেনে ছিঁড়ে ফেলা ইত্যাদি সবই হারাম এবং ধৈর্য্য ধারণের পরিপন্থী।

xvi. বদনজর থেকে বাঁচার চেষ্টাঃ

গর্ভধারণের খবর সবাইকে বলে বেড়ানো অনেক সময় বদনযরের কারন হয়ে থাকে। নিতান্ত কাছের আত্মীয়স্বজন ছাড়া বাইরের কারো কাছে এই সুখবর প্রয়োজন না পড়লে না বলা ভাল। অবশ্য ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সবাইকে জানাতে বাধা নেই। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'কিছু খুশির সংবাদ গোপন রাখতে হয়। কেননা প্রত্যেক সংবাদ শ্রবণকারী বন্ধু হয় না।' [১২৭]

হাদিসটির উদ্দেশ্য হলো হিংসা ও বদ নজরের প্রভাব মানুষের ওপর পড়ে। আর যে নিষ্পাপ শিশুটি আগত তাকে বদ নজর থেকে হেফাজতে রাখা একজন মায়ের দায়িত্ব। তাই মায়ের জন্য উচিত গর্ভের সংবাদ শুধু তাদেরই দেওয়া যারা তাতে খুশি হবে। কোনোরূপ খারাপ ধারণা পোষণ করবে না। পাশাপাশি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করা, যাতে আল্লাহর এই কৃতজ্ঞতা আদায়ের প্রভাব আগত বাচ্চার মধ্যেও স্থানান্তরিত হয়। নিয়তও খালেস রাখা চাই।

বদনজর এড়াতে নিয়মিত কুরআনি আমলগুলো করা যেতে পারে। নিয়মিত কুরআনি আমলে আল্লাহ তাআলা বদনজর থেকে মুক্ত করবেন। আর তাহলো-সুরা ফাতিহা পড়া, আয়াতুল কুরসি পড়া (সুরা বাকারা, আয়াত ২৫৫), সুরা বাকারার শেষের দুই আয়াত (২৮৫ ও ২৮৬), সুরা ইখলাস পড়া,সুরা ফালাক্ব পড়া এবং সুরা নাস পড়া।

বদনজরে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য ঝাঁড় ফুকের সময় এ দোয়া পড়া-

بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حاَسِدٍ اللهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ

অর্থ: আল্লাহর নামে কষ্ট দানকারীর সব অনিষ্টতা থেকে তোমাকে ঝাঁড়-ফুক করছি। হিংসুক ব্যক্তির কুদৃষ্টির অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর নামে তোমাকে ঝাঁড়-ফুক করছি। আল্লাহ তোমাকের আরোগ্য দান করতে তারই নামে ঝাঁড়-ফুক করছি।' (বুখারি ও মুসলিম)

أَعُوذُ بِكَلِماَتِ اللهِ التاَّمَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطاَنٍ وَ هاَمَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

অর্থ: 'আল্লাহর পরিপূর্ণ কালামসমূহের মাধ্যমে শয়তানের সব আক্রমণ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। বিষধর প্রাণীর ও বদনজরকারীর অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।' (বুখারি)

بِسْمِ اللهِ يُبْرِيْكَ ومِنْ كُلِّ داَءٍ يَشْفِيْكَ، ومِنْ شَرِّ حاَسِدٍ إِذاَ حَسَدَ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِيْ عَيْنٍ

অর্থ: 'আল্লাহর নামে শুরু করছি, তিনি তোমাকে মুক্ত করুন, প্রত্যেক অসুখ থেকে আরোগ্য দান করুন, প্রত্যেক হিংসুকের হিংসা থেকে এবং প্রত্যেক বদনযরের অনিষ্ট থেকে (মুক্ত করুন)।' (মুসলিম)

মাসনূন দোয়াগুলি যেভাবে সকাল সন্ধা পড়া হয়, সেভাবে উক্ত দোয়াটিও সকাল সন্ধা তিনবার করে পড়বে। [90]

xvii. দান সাদাকা বেশি বেশি করা

গর্ভাবস্থায় বেশি বেশি দান সাদাকার ফিকির করা উচিত। দান-সাদাকার অনেক ফজিলত রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা নফল সদকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে বলেন:

﴿مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١﴾ [البقرة: 261]

"যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি বীজের মত, যা উৎপন্ন করল সাতটি শীষ, প্রতিটি শীষে রয়েছে একশ' দানা। আর আল্লাহ যাকে চান তার জন্য বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ"। [১২৮]

অপর আয়াতে তিনি বলেন:

﴿وَيُطۡعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسۡكِينٗا وَيَتِيمٗا وَأَسِيرًا ٨﴾ [الدهر: 8]

“তারা খাদ্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে”। [১২৯]

হাদীস থেকে সদকার প্রতি উৎসাহ প্রদান:

প্রথম হাদীস:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْل - (يعني بمقدار أو بقيمة) - تَمْرَةٍ مِن كَسْبٍ طَيِّب وَلا يقبلُ اللهُ إلا الطَّيِّب فإنَّ الله يتقبلها بيمينِه، ثم يُرْبيها لصاحبها (يعني يَزيدُها) كما يُرَبِّي أَحَدُكُم فَلُوَّه، حتى تكونَ مِثْلُ الجبل».

“যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে খেজুর পরিমাণ (অর্থাৎ খেজুর বা তার মূল্য) সদকা করল, (আল্লাহ হালাল ব্যতীত গ্রহণ করেন না) তিনি অবশ্যই সেটি ডান হাত দিয়ে গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি সেটি তার মালিকের জন্য প্রতিপালন করেন। (অর্থাৎ বাড়াতে থাকেন) যেমন, তোমাদের কেউ উটের বাচ্চাকে প্রতিপালন করে, অবশেষে তা উহুদ পরিমাণ হয়”।(সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম) আরবীতে فَلُوَّ বলা হয় উটের সে বাচ্চাকে, সবেমাত্র যার থেকে মায়ের দুধ ছাড়ানো হয়েছে।

দ্বিতীয় হাদীস:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«يقول العبد: مالِي مالِي، إنما له مِن مالِهِ ثلاث: ما أَكَلَ فأفنَى، أو لَبِسَ فأَبْلَى، أو أعطَى فاقتنَى - (يعني تصدَّق فادَّخَرَ لنفسه حسناتٍ يوم القيامة) ، وما سِوَى ذلك فهو ذاهِبٌ وتارِكُهُ للناس».

“বান্দা বলে: আমার সম্পদ, আমার সম্পদ, অথচ সে মাত্র তিনটি বস্তুর মালিক: যা খেয়ে হজম করেছে অথবা যা পরিধান করে পুরান করেছে অথবা যা সদকা করে সঞ্চয় করেছে। (অর্থাৎ সদকা করে কিয়ামতের দিনের জন্য নিজের নেকি উপার্জন করেছে)। এ ছাড়া বাকিসব ধ্বংস হবে ও তা মানুষের জন্য রেখে যাবে”।[১৩০]

তৃতীয় হাদীস:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«ما منكم مِن أحدٍ إلا سَيُكَلِّمُهُ الله، ليس بينه وبينه تُرْجُمَان، فينظرُ أيْمَنَ منه، فلا يرى إلا ما قَدَّمَ، فينظرُ أشأمَ منه فلا يرى إلا ما قَدَّمَ، وينظرُ بين يديه فلا يرى إلا النارَ تِلقاءَ وَجهِه، فاتقوا النارَ وَلَو بِشِقّ تَمرة "، وفي رواية: مَن استطاعَ منكم أنْ يَسْتَتِرَ مِن النار وَلَو بِشِقّ تَمرة فَلْيَفعَلْ».

“তোমাদের এমন কেউ নেই, আল্লাহ যার সাথে দোভাষী ছাড়া কথা বলবেন না, সে তার ডানে তাকাবে অগ্রে যা পাঠিয়েছে তা ব্যতীত কিছুই দেখবে না, অতঃপর তার বাঁয়ে দেখবে, অগ্রে যা পাঠিয়েছে তা ব্যতীত কিছুই দেখবে না, সামনে তাকাবে চেহারার সমীপে আগুন ব্যতীত কিছুই দেখবে না। অতএব, তোমরা আগুন থেকে বাচ, যদিও এক টুকরো খেজুর দিয়ে হয়”। অপর বর্ণনায় এসেছে: “তোমাদের কেউ যদি একটি খেজুর দিয়ে আগুন থেকে আড়াল হতে পারে, সে যেন তাই করে”। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

চতুর্থ হাদীস:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«كُلُّ امْرِئٍ في ظِلِّ صَدَقَتِه حتى يُقضَى بين الناس» وقال أيضاً: «إنَّ الصدقة لَتُطْفِئُ عن أهلها حَرّ القبور، وإنما يَسْتَظل المؤمن يوم القيامة في ظِلِّ صَدَقَتِه».

"প্রত্যেক মানুষ তার সদকার ছায়ার নিচে অবস্থান করবে, যতক্ষণ না মানুষের মাঝে ফয়সালা করা হবে"।[১৩১]

তিনি আরও বলেন: "নিশ্চয় সদকা কবরের গরম থেকে ব্যক্তিকে মুক্তি দেয়। কিয়ামতের দিন মুমিন তার সদকার ছায়ার নিচে আশ্রয় নিবে"।[১৩২]

পঞ্চম হাদীস:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«والصدقة تُطفِئُ الخَطيئة كما يُطفِئُ الماءُ النار».

"সদকা পাপ মুছে দেয়, যেমন পানি আগুন নিভিয়ে দেয়"।[১৩৩] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ

أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّارَ فَأَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثُمَّ قَالَ " اتَّقُوا النَّارَ " . ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ " اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ " . وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو كُرَيْبٍ كَأَنَّمَا وَقَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ .

আবূ বকর ইবনু আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহঃ) ... আদী ইবনু হাতিম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহান্নামের আলোচনা করলেন। অতঃপর তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং ভ্রুকুঞ্চিত করলেন। এরপর বললেন, তোমরা আগুন থেকে বাঁচ। এবারও তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। এমনকি আমাদের ধারণা হল তিনি যেন আগুন দেখতে পাচ্ছেন। এরপর বললেন, এক টুকরা খেজুর দিয়ে হলেও তোমরা আগুন থেকে বাঁচ। যদি সে তা না পায় তবে একটি উত্তম কথার বিনিময়ে হলেও।

ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন, আবূ কুয়ায়ব (রহঃ) তাঁর বর্ণনায়,كَأَنَّمَا শব্দটি উল্লেখ করেননি এবং বলেন, আমাদের কাছে আবূ মু'আবিয়া রিওয়ায়াত করেছেন যে, আ'মাশ এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। [১৩৪]

শাস্তির দিন এসে পড়ার আগে পাপীর উচিত পাপ বর্জন করে মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। নাবী (সা.) একদিন মহিলাদের উদ্দেশে বললেন,

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الاِسْتِغْفَارَ فَإِنِّى رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ

''হে নারীসমাজ! তোমরা দান-সাদকাহ করতে থাক ও বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা কর। কারণ আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের অধিবাসীদের অধিকাংশই তোমাদেরকে দেখলাম।''[১৩৫]

xviii. ভাল কাজের ফিকির করাঃ

যারা কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য এ পৃথিবীতে আছে কল্যাণ। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পৃথিবীতে সুস্থতা ও নিরাপত্তা, বিজয় ও গনীমত ইত্যাদি প্রদান করে থাকেন। আর তাই গর্ভাবস্থায় সর্বক্ষণ ভাল কাজের চিন্তা করা দরকার। গর্ভের সন্তানের উপর এর ভাল প্রভাব পরবে ইনশাআল্লাহ। সাধারণভাবে ভালো কাজ খারাপ কাজকে মুছে ফেলে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

''নিশ্চয় ভালো কাজগুলো মন্দকাজগুলোকে মিটিয়ে দেয়।'' [১৩৬]

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কাবীরা গুনাহ ছাড়া অন্যান্য গুনাহ আল্লাহ তা'আলা সাধারণ নেক কাজের মাধ্যমে এমনিতেই ক্ষমা করে দেন। এর জন্য বিশেষ তাওবাহ্ জরুরি নয়। বিভিন্ন 'আমলের মাধ্যমেই এসব গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তবে বিভিন্ন হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, কিছু কিছু কাবীরা গুনাহও বিশেষ পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মের মাধ্যমে ক্ষমা করে দেন। ভাল কাজের উপদেশ আর মন্দ থেকে বিরত থাকতে বলা একটি ভাল আমল। পরিবার-পরিজনকে সালাত সময়মত আদায় করতে বলা, দ্বীন নিয়ে আলাপ করা, পারিবারিক কুরআনের মজলিসের আয়োজন করা যেতে পারে।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "পরিবার পরিজনকে সালাত আদায় করার নির্দেশ দিন এবং নিজেও সালাত অব্যাহত রাখুন।" [১৩৭] মহানবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদাই এ নির্দেশ পালন করেছেন। কোন মতবাদ ও কর্মসূচীতে পরিবারের লোকজন ও নিকটবর্তী আতীয়-স্বজন সহযোগী ও সমমনা না হলে সে মতবাদ অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এ কারণেই প্রাথমিক যুগে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রচারকার্যের জবাবে সাধারণ লোকদের উত্তর ছিল যে, প্রথমে আপনি নিজ পরিবার কোরায়শকে ঠিক করে নিন; এরপর আমাদের কাছে আসুন।

xix. কুরআন মুখস্ত করার টার্গেট

এ সময়ে আরেকটি ভাল আমল হতে পারে কুরআনের কিছু অংশ বা কোন বিশেষ সুরা টার্গেট ঠিক করে মুখস্ত করা। এ কিতাবের একটি হরফ পাঠ করলে পাওয়া যায় দশটি সওয়াব। [১৩৮] হাদিসে এসেছে, এই কুরআনের (শুদ্ধপাঠকারী ও পানির মত হিফযকারী পাকা) হাফেয মহাসম্মানিত পূতচরিত্র লিপিকার (ফিরিশ্তাবর্গের) সঙ্গী হবে। আর যে ব্যক্তি (পাকা হিফয না থাকার কারণে) কুরআন পাঠে 'ওঁ-ওঁ' করে এবং পড়তে কষ্টবোধ করে তার জন্য রয়েছে দুটি সওয়াব। একটি তিলাওয়াত ও দ্বিতীয়টি কষ্টের দরুন। [১৩৯]

অন্য আরেকটি হাদিসে এসেছে,

কিয়ামতের দিন কুরআন উপস্থিত হয়ে বলবে, হে প্রভু! কুরআন পাঠকারীকে অলংকৃত করুন।' সুতরাং তাকে সম্মানের মুকুট পরানো হবে। পুনরায় কুরআন বলবে, 'হে প্রভু! ওকে আরো অলংকার প্রদান করুন।' সুতরাং তাকে

সম্মানের পোশাক পরানো হবে। অতঃপর বলবে, ‘হে প্রভু! আপনি ওর উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান।’ সুতরাং আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হবেন। অতঃপর তাকে বলা হবে, ‘তুমি পাঠ করতে থাক আর মর্যাদায় উন্নীত হতে থাক।’ আর প্রত্যেকটি আয়াতের বিনিময়ে তার একটি করে সওয়াব বৃদ্ধি করা হবে। [১৪০]

হাদিসে আরও আছে, কুরআন তিলাওয়াতকারীকে বলা হবে, ‘পড়তে থাক ও মর্যাদায় উন্নীত হতে থাক। আর (ধীরে-ধীরে, শুদ্ধ ও সুন্দরভাবে কুরআন) আবৃত্তি কর; যেমন দুনিয়ায় অবস্থানকালে আবৃত্তি করতে যেহেতু যা তুমি পাঠ করতে তার সর্বশেষ আয়াতের নিকট তোমার স্থান হবে।’[১৪১]

xx. জ্ঞানার্জন করা

গর্ভাবস্থায় ইসলামী জ্ঞান অর্জন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম একটি উপায়। ইসলামে জ্ঞান অর্জন অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। দ্বীনের ইলম অর্জন করাকে আল্লাহ তা’আলা ফরজ করে দিয়েছেন। কুরআন কারীমে আল্লাহ পাক বলেন,

﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ (طه: ١١٤)

অর্থাৎ বল, হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর। [১৪২]

তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (الزمر: ٩)

অর্থাৎ বল, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? [১৪৩]

আল্লাহ আরও বলেন,

﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ (المجادلة: ١١)

অর্থাৎ যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে বহু মর্যাদায় উন্নত করবেন। [১৪৪]

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (فاطر: ٢٨)

অর্থাৎ আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে থাকে। [১৪৫]

মুআবিয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকেই দ্বীনী জ্ঞান দান করেন।” [১৪৬]

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً، سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الجَنَّةِ» . رواه مسلم

আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি এমন পথে গমন করে; যাতে সে বিদ্যা (জ্ঞান) অর্জন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন।” [১৪৭]

وَعَن أَبي أُمَامَة رضي الله عنه: أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم : إنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الحُوْتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِي النَّاسِ الخَيْرَ». رواه الترمذي، وقال: حديث حسن

আবূ উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আলেমের ফযীলত আবেদের উপর ঠিক সেই রূপ, যেরূপ আমার ফযীলত তোমাদের উপর।” তারপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল, আসমান-জমিনের সকল বাসিন্দা এমনকি গর্তের মধ্যে পিঁপড়ে এবং (পানির মধ্যে) মাছ পর্যন্ত মানবমন্ডলীর শিক্ষাগুরুদের (আলিমদের) জন্য মঙ্গল কামনা ও নেক দো’আ করে থাকে।” [১৪৮]

এখন প্রশ্ন, কীভাবে ইলম অনুসন্ধান করতে হবে? ইলম অর্জিত হবে,

১. ইলম অনুসন্ধানের বৈঠক উপস্থিত হয়ে।

২. উপকারী বইসমূহ পাঠ করে যদি সে তা বুঝে।

৩. জুমু‘আর খুৎবা ও অন্যান্য বক্তব্য শ্রবণের মাধ্যমে।

৪. জ্ঞানীদেরকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে। এ সবই হচ্ছে ইলম অনুসন্ধানের উপকারী পন্থাসমূহ।

৫. কুরআন কারীম হিফয করার মাধ্যমে। আর ইলম অর্জনের ব্যাপারে কুরআনই হলো আসল বা মূল। অতএব, কুরআনই সকল ইলমের প্রধান। আর এটি হলো মহাভিত্তি। আর এটি আল্লাহর মজবুত রশি এবং এটি মহাগ্রন্থ, এটি মর্যাদাবান কিতাব, এটি কল্যাণের দিকে পথপ্রদর্শনকারী, অকল্যাণের পথের বড় প্রতিবন্ধক।

তাই আমি প্রত্যেক মুমিন নর ও নারীকে গভীরভাবে চিন্তার ও বুঝের সাথে কুরআনের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া, তা বেশি বেশি তেলাওয়াত করা, তা সম্পূর্ণ বা যা সম্ভব হিফয করার প্রতি অসিয়ত করছি। কারণ, এতে হিদায়াত ও নূর আছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ يَهۡدِي لِلَّتِي هِيَ أَقۡوَمُ ﴾ [الاسراء: ٩]

“নিশ্চয় এ কুরআন দিক-নির্দেশনা দেয় এমন পথের যা সর্বাধিক সরল।” [১৪৯]

xxi. আল্লাহ যেসব বিষয়ে ছাড় দিয়েছেন তা গ্রহণ করা

আল্লাহ পাক দুগ্ধপানকারিনী ও গর্ভবতী মায়ের জন্য রোজা আদায় করার ব্যাপারে অবকাশ দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে দুইটি অবস্থা হতে পারে:

১. রোজা রাখার দ্বারা তার স্বাস্থ্যের উপর কোন প্রভাব না পড়া। অর্থাৎ তার জন্য রোজা রাখাটা কষ্টকর না হওয়া এবং তার সন্তানের জন্যেও আশংকাজনক না হওয়া। এমন নারীর উপর রোজা রাখা ফরজ; তার জন্য রোজা ভাঙ্গা নাজায়েয।

২. রোজা রাখলে তার নিজের স্বাস্থ্য অথবা সন্তানের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়ার আশংকা করা এবং তার জন্যে রোজা রাখাটা কষ্টকর হওয়া। এমন নারীর জন্য রোজা না-রাখা জায়েয আছে; তিনি এ রোজাগুলো পরবর্তীতে কাযা পালন করবেন। বরং অবস্থায় এ নারীর জন্য রোজা না-রাখাই উত্তম; রোজা রাখা মাকরূহ। বরং কোন কোন আলেম উল্লেখ করেছেন যদি তার সন্তানের স্বাস্থ্যের ক্ষতির আশংকা হয় তাহলে তার উপর রোজা ছেড়ে দেয়া ফরজ; রোজা রাখা হারাম।

আল-মুরদাউয়ি 'আল-ইনসাফ' নামক গ্রন্থে (৭/৩৮২) বলা হয়েছে:

"এমতাবস্থায় এ নারীর জন্য রোজা রাখা মাকরূহ...। ইবনে আকীল উল্লেখ করেছেন যে, গর্ভবতী ও দুগ্ধপানকারিনী নারী যদি নিজের গর্ভস্থিত ভ্রূণ ও সন্তানের ক্ষতির আশংকা করেন তাহলে রোজা রাখা জায়েয হবে না; আর যদি ক্ষতির আশংকা না করেন তাহলে রোজা ছেড়ে দেয়া জায়েয হবে না।" [১৫০]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) ফাতাওয়া আল-সিয়াম গ্রন্থে (পৃষ্ঠা- ১৬১) বলেন:

যদি গর্ভবতী ও দুগ্ধপানকারিনী নারী শারীরিকভাবে সবল ও কর্মোদ্যমী হয়, রোজা রাখার দ্বারা তার স্বাস্থ্যের উপর কোন প্রভাব না পড়ে; তদুপরি কোন ওজর ছাড়া রোজা না-রাখে এর হুকুম কি?

তিনি উত্তরে বলেন:

"গর্ভবতী ও দুগ্ধপানকারিনী নারীর জন্য কোন ওজর ছাড়া রমজান মাসের রোজা না-রাখা জায়েয নয়। যদি ওজরের কারণে রোজা না-রাখে তাহলে রোজা কাযা করতে হবে। দলিল হচ্ছে- আল্লাহর বাণী: "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে সে অন্যদিনগুলোতে এ সংখ্যা পূর্ণ করবে"[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৫] আর এ দুই শ্রেণীর নারী অসুস্থ ব্যক্তির পর্যায়ভুক্ত। যদি এ দুই শ্রেণীর নারীর ওজর হয় 'তাদের সন্তানের স্বাস্থ্যহানির আশংকা' তাহলে কোন কোন আলেমের মতে, এরা রোজাগুলোর কাযা পালনের সাথে প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে গম, চাল, খেজুর বা স্থানীয় প্রধান কোন খাদ্য সদকা করবে। আর কোন কোন আলেমের মতে, কোন অবস্থাতে তাদেরকে কাযা পালন ছাড়া আর কিছু করতে হবে না। কারণ খাদ্য প্রদানের পক্ষে কিতাব ও সুন্নাহর কোন দলিল নেই। আর দলিল সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তি যে কোন প্রকার দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকা- মৌলিক বিধান। এটি ইমাম আবু হানিফার মাযহাব ও মজবুত অভিমত।"

শাইখ উছাইমীনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল (ফাতাওয়াস সিয়াম পৃষ্ঠা-১৬২):

গর্ভবতী নারী যদি নিজের স্বাস্থ্যহানি বা সন্তানের স্বাস্থ্যহানির আশংকায় রোজা না রাখে এর কী হুকুম?

উত্তরে তিনি বলেন: "আমাদের জবাব হচ্ছে- গর্ভবতী নারীর দুইটি অবস্থার কোন একটি হতে পারে:

১. শারীরিকভাবে শক্তিশালী ও কর্মোদ্যমী হওয়া, রোজা রাখতে কষ্ট না হওয়া, গর্ভস্থিত সন্তানের উপর কোন প্রভাব না পড়া- এ নারীর উপর রোজা রাখা ফরজ। যেহেতু রোজা ছেড়ে দেয়ারজন্য তার কোন ওজর নেই।

২. গর্ভবতী নারী রোজা রাখতে সক্ষম না হওয়া: গর্ভ ধারণের কাঠিন্যের কারণে অথবা তার শারীরিক দুর্বলতার কারণে অথবা অন্য যে কোন কারণে। এ অবস্থায় এ নারী রোজা রাখবে না। বিশেষতঃ যদি তার গর্ভস্থিত সন্তানের ক্ষতির আশংকা করে সেক্ষেত্রে রোজা ছেড়ে দেয়া তার উপর ফরজ। যদি সে রোজা ছেড়ে দেয় তাহলে অন্য ওজরগ্রস্ত ব্যক্তিদের যে হুকুম তার ক্ষেত্রেও একই হুকুম হবে তথা পরবর্তীতে এ রোজাগুলো কাযা পালন করা তার উপর ফরজ। অর্থাৎ সন্তান প্রসব ও নিফাস থেকে পবিত্র হওয়ার পর এ রোজাগুলো কাযা পালন করা তার উপর ফরজ। তবে কখনো হতে পারে গর্ভধারণের ওজর থেকে সে মুক্ত হয়েছে ঠিক; কিন্তু নতুন একটি ওজরগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, অর্থাৎ দুগ্ধপান করানোর ওজর। দুগ্ধপানকারিনী নারী পানাহার করার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়তে পারে; বিশেষতঃ গ্রীষ্মের দীর্ঘতর ও উত্তপ্ত দিনগুলোতে। এ দিনগুলোতে এমন নারী তার সন্তানকে বুকের দুধ পান করানোর জন্য রোজা ছেড়ে দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে। এমতাবস্থায় আমরা সে নারীকে বলব: আপনি রোজা ছেড়ে দিন। এ ওজর দূর হওয়ার পর আপনি এ রোজাগুলো কাযা পালন করবেন।" [১৫১]

শাইখ বিন বায (মাজমুউল ফাতাওয়া ১৫/২২৪) বলেন:

"গর্ভবতী ও দুগ্ধপানকারিনী নারীর ব্যাপারে ইমাম আহমাদ ও সুনান সংকলকগণের গ্রন্থে সহিহ সনদে আনাস বিন মালিক আল-কাবী এর বর্ণিত হাদিস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি এ দুই প্রকারের নারীকে রোজা ছেড়ে দেয়ার অবকাশ দিয়েছেন এবং এদেরকে মুসাফিরের পর্যায়ে গণ্য করেছেন। অতএব, জানা গেল যে, এরা মুসাফিরের মত রোজা না-রেখে পরবর্তীতে কাযা পালন করবে। আলেমগণ উল্লেখ করেছেন যে, রোগীর অনুরূপ কষ্ট না হলে অথবা সন্তানের স্বাস্থ্যহানির আশংকা না থাকলে এ দুই শ্রেণীর নারীগণ রোজা ছেড়েদিবে না। [১৫২]

ব্যক্তিগত কিছু অভিজ্ঞতাঃ

আমি আমার দ্বিতীয় সন্তান আব্দুর রহমানের জন্মের আগে সুরা আর রহমান মুখস্ত করব বলে ঠিক করেছিলাম আর তৃতীয় সন্তান আব্দুল্লাহর সময় মুখস্তের জন্য নিয়েছিলাম সুরা ওয়াকিয়া। আলহামদুলিল্লাহ, আব্দুল্লাহ জন্মের পর যখন ভাল করে কথা বলতেও পারতনা, তখন ও আমার সাথে সাথে সুরা ওয়াকিয়া পড়ার চেষ্টা করত। আর ওর জন্মের সময় অপারেশন থিয়েটার যাওয়ার আগ থেকে শুরু করে হসপিটাল থাকার পুরো সময় যতখানি সম্ভব দুয়া করে গেছি। আল্লাহর অশেষ রহমতে সেই দুয়াগুলো কবুল হতেও দেখেছি।

গর্ভস্থ সন্তান বা সন্তান জন্ম গ্রহনের পর মারা গেলে পিতা-মাতার ফজিলত

নিঃসন্দেহে যার সন্তান মারা যায় তার জন্য দুনিয়া এক কঠিন পরীক্ষা ক্ষেত্র হয়ে যায়। কুরআন এবং সুন্নাহ অনুযায়ী অনেক বর্ণনা আছে, যেখানে বলা হয়েছে আল্লাহ তা'আলা ধৈর্য ধারণকারীদের অসংখ্য পুরস্কার নির্ধারণ করে রেখেছেন। সুতরাং, ধৈর্য ধারন করার অসংখ্য ফজিলত ও নেয়ামত রয়েছে। এর মধ্যে কোন বিপদ বা দুর্যোগের মধ্যে সবর করা যে বিপদটি দিয়ে তাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে, তা অন্তর্ভুক্ত। আর অবশ্যই সন্তান হারানোর বেদনা মানুষের জীবনে অন্যতম একটি বড় দুর্যোগ। যে ব্যক্তি এই বিপদে পতিত হবে এবং ধৈর্যের সঙ্গে আল্লাহর ইচ্ছা এবং

কদরের বিধান মেনে নিবে, তার জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার। নীচে বর্ণীত আয়াতগুলো বিপদে নিমজ্জিত মানুষদের জন্য হতে পারে আশার আলো।

وَ كَاَيِّنۡ مِّنۡ نَّبِیٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّیُّوۡنَ كَثِیۡرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوۡا لِمَاۤ اَصَابَهُمۡ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ وَ مَا ضَعُفُوۡا وَ مَا اسۡتَكَانُوۡا ؕ وَ اللّٰهُ یُحِبُّ الصّٰبِرِیۡنَ ﴿۱۴۶﴾

আর কত নবী ছিল, যার সাথে থেকে অনেক আল্লাহওয়ালা লড়াই করেছে। তবে আল্লাহর পথে তাদের উপর যা আপতিত হয়েছে তার জন্য তারা হতোদ্যম হয়নি। আর তারা দুর্বল হয়নি এবং তারা নত হয়নি। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে ভালবাসেন। [১৫৩]

قُلۡ یٰعِبَادِ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوۡا رَبَّكُمۡ ؕ لِلَّذِیۡنَ اَحۡسَنُوۡا فِیۡ هٰذِهِ الدُّنۡیَا حَسَنَةٌ ؕ وَ اَرۡضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ؕ اِنَّمَا یُوَفَّی الصّٰبِرُوۡنَ اَجۡرَهُمۡ بِغَیۡرِ حِسَابٍ ﴿۱۰﴾

বল, 'হে আমার মুমিন বান্দারা যারা ঈমান এনেছ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর। যারা এ দুনিয়ায় ভাল কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। আর আল্লাহর যমীন প্রশস্ত, কেবল ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেয়া হবে কোন হিসাব ছাড়াই।'[১৫৪]

সবরকারীদের সওয়াব কোন নির্ধারিত পরিমাণে নয়- অপরিসীম ও অগণিত দেয়া হবে। কেউ কেউ এর অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, দুনিয়াতে কারও কারও কোন প্রাপ্য থাকলে তাকে নিজের প্রাপ্য দাবী করে আদায় করতে হয়। কিন্তু আল্লাহর কাছে দাবী ব্যতিরেকেই সবরকারীরা তাদের সওয়াব পাবে। ইমাম মালেক রাহেমাহুল্লাহ এ আয়াতে صَابِرِيْنَ এর অর্থ নিয়েছেন, যারা দুনিয়াতে বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টে সবর করে। কেউ কেউ বলেন, যারা পাপকাজ থেকে সংযম অবলম্বন করে, আয়াতে তাদেরকে صابر বলা হয়েছে। কুরতুবী বলেন صَابِرُونَ শব্দকে অন্য কোন শব্দের সাথে সংযুক্ত না করে ব্যবহার করলে তার অর্থ হয় পাপকাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার কষ্ট সহ্যকারী। পক্ষান্তরে বিপদাপদে সবরকারী অর্থে ব্যবহার করা হলে তার সাথে সে বিপদও সংযুক্ত হয়ে উল্লেখিত হয়। তবে সত্যনিষ্ঠ একদল মুফাফসিরের মতে এখানে صابر বলে সাওম পালনকারীদের বোঝানো হয়েছে। [কুরতুবী, তাবারী]

ঈমান ও তাকওয়ার পথে কষ্ট অনিবার্য এবং প্রবৃত্তি ও আত্মার চাহিদাকেও কুরবানী করা অবধারিত। যার জন্য ধৈর্যের দরকার। এই জন্য ধৈর্যশীলদের মাহাত্ম্যও বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে যে, তাদেরকে তাদের ধৈর্যের প্রতিদান এমন অপরিসীম ও অগণিত রূপে দেওয়া হবে যা কোন ওজন বা হিসাবের যন্ত্র দ্বারা ওজন বা হিসাব করা সম্ভব হবে না। অর্থাৎ তাদের পুরস্কার অপরিমিত হবে। কারণ যার হিসাব করা যায়, তার একটি সীমা থাকে আর যার কোন সীমা ও শেষ নেই,তা গণনা করা অসম্ভব। এটি ধৈর্যের এমন বৃহৎ মাহাত্ম্য যা অর্জন করার চেষ্টা প্রত্যেক মুসলিমকে করা উচিত। কারণ অধৈর্য হয়ে হা-হুতাশ, ক্ষোভ প্রকাশ বা কান্না-কাটি করে কষ্ট ও বিপদ দূর করা যায় না, যে কল্যাণ ও বাঞ্ছিত জিনিস লাভে বঞ্চনা আসে, তা অর্জন করা যায় না এবং যে অপছন্দনীয় অবস্থা এসে যায়, তা দূর করা সম্ভব হয় না। অতএব মানুষের উচিত, সবর করে সেই বৃহৎ সওয়াবের অধিকারী হওয়া, যা আল্লাহ তাআলা সবরকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন।

এই সময়ে বেশি বেশি সীরাহ পাঠ করলে মনের অবস্থা কিছুটা পরিবর্তিত হবে ইনশাআল্লাহ। রাসুল (সাঃ) তাঁর জিবদ্দশায় ফাতিমা (রাঃ) ছাড়া আর সব সন্তানকে হারিয়েছেন। সন্তান হারা পিতা-মাতাকে মানুষ কটু কথা বলতেও

ছাড়েনা। রাসুল (সঃ)-এর প্রানপ্রিয় পুত্র ইব্রাহিম মারা যাবার পর, তাঁকে তাঁর প্রতিবেশী আবু জেহেল অনেক কটু কথা শুনিয়েছে। সে বলছিল, মুহাম্মাদের তো বংশধর বলে আর কিছু রইলনা। সেই পরিস্থিতিতে আল্লাহ পাক সুরা কাউসার নাজিল করে রাসুল (সঃ) কে হাউসে কাউসারের সুসংবাদ দান করেন। [১৮৯] এখনও আমাদের সমাজে সন্তান না হলে, বা গর্ভে মারা গেলে বা জন্মের পর মারা গেলে, পিতা-মাতাকে কঠিন কথা বলতে ছাড়েনা। অথচ,এর পেছনে যে আল্লাহ তা'আলার হিকমা রয়েছে, তা ভাবেনা। একজন পিতার কাঁধে সবচে ভারী হচ্ছে সন্তানের লাশ। এরকম কঠিন পরিস্থিতিতে কুরআনে বর্ণিত সবরের আয়াত মনের দুঃখ,হতাশা,কষ্ট কাটিয়ে অন্তরে প্রশান্তি আনবে। মনে প্রশান্তি আনা আরও কিছু কুরআনের আয়াতঃ

وَ لَنَبۡلُوَنَّکُمۡ بِشَیۡءٍ مِّنَ الۡخَوۡفِ وَ الۡجُوۡعِ وَ نَقۡصٍ مِّنَ الۡاَمۡوَالِ وَ الۡاَنۡفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ ؕ وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِیۡنَ ﴿۱۵۵﴾

الَّذِیۡنَ اِذَاۤ اَصَابَتۡهُمۡ مُّصِیۡبَۃٌ ۙ قَالُوۡۤا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَیۡهِ رٰجِعُوۡنَ ﴿۱۵۶﴾

اُولٰٓئِکَ عَلَیۡهِمۡ صَلَوٰتٌ مِّنۡ رَّبِّهِمۡ وَ رَحۡمَۃٌ ۟ وَ اُولٰٓئِکَ هُمُ الۡمُهۡتَدُوۡنَ ﴿۱۵۷﴾

আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যারা, তাদেরকে যখন বিপদ আক্রান্ত করে তখন বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তাদের উপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রহমত এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত। [১৫৫]

মূলত: মানুষের ঈমান অনুসারেই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে পরীক্ষা করে থাকেন। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সবচেয়ে বেশী পরীক্ষা, বিপদাপদ-বালা মুসিবত নবীদেরকে প্রদান করেন। তারপর যারা তাদের পরের লোক, তারপর যারা এর পরের লোক, তারপর যারা এর পরের লোক।" [১৫৬] অর্থাৎ প্রত্যেকের ঈমান অনুসারেই তাদের পরীক্ষা হয়ে থাকে। তবে পরীক্ষা যেন কেউ আল্লাহর কাছে কামনা না করে। বরং সর্বদা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা কামনা করাই মুমিনের কাজ। এই আয়াতগুলোতে রয়েছে ধৈর্য ধারণকারীদের জন্য সুসংবাদ।

সুরা আল-আসর, যেখানে ধৈর্যধারণের উপদেশের কথা বিশেষ ভাবে,উল্লেখ করা হয়েছে;

وَ الۡعَصۡرِ ۙ﴿۱﴾

اِنَّ الۡاِنۡسَانَ لَفِیۡ خُسۡرٍ ۙ﴿۲﴾

اِلَّا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوۡا بِالۡحَقِّ ۬ۙ وَ تَوَاصَوۡا بِالصَّبۡرِ ﴿۳﴾

সময়ের কসম, নিশ্চয় সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ততায় নিপতিত। তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে। [১৫৭]

এখানে ২য় আয়াতে বর্ণিত মানবজাতি যে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ততার মধ্যে আছে তার থেকে উত্তরণের পথ বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, এই ক্ষতির কবল থেকে কেবল তারাই মুক্ত, যারা চারটি বিষয় নিষ্ঠার সাথে পালন করে— ঈমান, সৎকর্ম, অপরকে সত্যের উপদেশ এবং সবরের উপদেশদান। দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার এবং

মহা উপকার লাভ করার চার বিষয় সম্বলিত এ ব্যবস্থাপত্রের প্রথম দুটি বিষয় আত্মসংশোধন সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয় দুটি বিষয় অপর মুসলিমদের হেদায়েত ও সংশোধন সম্পর্কিত। 'সবর' শব্দের আক্ষরিক অর্থ নিজেকে বাধা দেয়া ও অনুবর্তী করা। এখানে কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক. যাবতীয় গোনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকা। দুই. সৎকাজ করা এবং এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। তিন. বিপদাপদে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা। [১৫৮] সুতরাং সৎকর্ম সম্পাদন, গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা এবং এতদসংক্রান্ত বিপদাপদ মোকাবেলা করা সবই 'সবর' এর শামিল।

সবরকারীগণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা বিপদের সম্মুখীন হলে – 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করে। এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, কেউ বিপদে পড়লে যেন এ দোআটি পাঠ করে। কেননা, এরূপ বলাতে একাধারে যেমন অসীম সওয়াব পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি যদি এ বাক্যের অর্থের প্রতি যথার্থ লক্ষ্য রেখে তা পাঠ করা হয়, তবে বিপদে আন্তরিক শান্তি লাভ এবং তা থেকে উত্তরণও সহজতর হয়ে যায়। দোআটির অর্থ হচ্ছে, "নিশ্চয় আমরা তো আল্লাহরই। আর আমরা তার দিকেই প্রতীবর্তন করব।" সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমাদের কোন কষ্ট দেন তবে তাতে কোন না কোন মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। তার উদ্দেশ্যকে সম্মান করতে পারা একটি মহৎ কাজ। আর এটাই হচ্ছে, সবর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মুমিনের কর্মকাণ্ড আশ্চর্যজনক। তার সমস্ত কাজই ভাল।

মুমিন ছাড়া আর কারও জন্য এমনটি হয় না। যদি তার কোন খুশীর বিষয় সংঘটিত হয় তবে সে শুকরিয়া আদায় করে, ফলে তা তার জন্য কল্যাণের হয়। আর যদি তার কোন ক্ষতিকর কিছু ঘটে যায় তবে সে সবর করে, ফলে তাও তার জন্য কলাণকর হয়।" [১৫৯] অপর হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে কেউ বিপদ-মুসিবতে পড়ে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন' বলবে, এবং বলবে, হে আল্লাহ আমাকে এ মুসিবত থেকে উদ্ধার করুন এবং এর থেকে উত্তম বস্তু ফিরিয়ে দিন" অবশ্যই আল্লাহ তাকে উত্তম কিছু ফিরিয়ে দিবেন।" [১৬০]। এই হাদীসে বিপদের সময় {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} এর সাথে (اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا) পড়ার ফযীলত ও তাকীদ এসেছে।

মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন মুসলিম মাতা-পিতার সামনে তিনটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান মৃত্যুবরণ করলে সন্তানদের উপরে আল্লাহর রহমত লাভের কারনে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তিনি বলেন, সন্তানদের বলা হবে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। তখন তারা বলবে, আমাদের মাতা-পিতা জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত আমরা জান্নাতে প্রবেশ করব না। তখন তাদের বলা হবে, তোমরা এবং তোমাদের মাতা-পিতা জান্নাতে প্রবেশ কর। [১৬১]

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، حَدَّثَتْنَا حَسْنَاءُ بِنْتُ مُعَاوِيَةَ الصَّرِيمِيَّةُ، قَالَتْ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ، وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْوَئِيدُ فِي الْجَنَّةِ

হাসনাআ বিনতু মু'আবিয়াহ আস-সারীমিয়্যাহ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার চাচা আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে? তিনি বললেনঃ নবীগণ (আঃ) জান্নাতে প্রবেশ করবেন, শহীদগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে, গর্ভের মৃত শিশু জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জীবন্ত প্রথিত সন্তান জান্নাতে প্রবেশ করবে। [১৬২]

হাদিসে এসেছে, মুমিনদের শিশু জান্নাতী পিতা-মাতার সাথে জান্নাতে যাবে। কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করে আর তাদের সন্তান-সন্ততি বিশ্বাসে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সাথে মিলিত করব তাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ। [১৬৩]

ঐ শিশুরা শুধু জান্নাতে যাবে তাই নয়, বরং পিতা-মাতা দোযখ যাওয়ার হকদার হলে, মহান আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে তাদেরকে বেহেশতে আনার চেষ্টা করবে।

নবী (ﷺ) বলেন, “সেই সত্তার শপথ; যার হাতে আমার প্রাণ আছে! গর্ভচ্যুত (মৃত) শিশু তার নাভির নাড়ী ধরে নিজের মাতাকে বেহেস্তের দিকে টেনে নিয়ে যাবে---যদি ঐ মা (তার গর্ভপাত হওয়ার সময়) ঐ সওয়াবের আশা রাখে তবে।” [১৬৪]

অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী, সে তার পিতা-মাতার কাপড় ধরে জান্নাতে নিয়ে যাবে। [১৬৫]

তিনি আরো বলেছেন, “যে মহিলার তিনটি শিশু মারা যাবে, সেই মহিলার জন্য ঐ শিশুরা জাহান্নাম থেকে পর্দা স্বরূপ হবে।” এক মহিলা বলল, আর দুটি মারা গেলে?” তিনি বললেন, “দুটি মারা গেলেও। (তারা তার মায়ের জন্য জাহান্নাম থেকে পর্দা হবে।)” [১৬৬]

বলাই বাহুল্য যে, যে অপরের জন্য জাহান্নামের পর্দা হবে, সে কি জাহান্নামে যাবে? বরং উভয়েই জান্নাতে যাবে। আর এ কথা স্পষ্টভাবে একাধিক হাদীসেও এসেছে যে, মুমিনদের শিশু-সন্তানরাও জান্নাতে যাবে। [১৬৭]

এই শিশুরা পিতামাতার জন্য জান্নাতে পূর্ব-প্রেরিত ব্যবস্থাপকের মত হবে। তারা ইব্রাহীম নবী (আঃ) এর তত্ত্বাবধানে মধ্যজগতে বাস করবে।

যার সন্তান মারা যায় তার সান্তনা লাভের জন্য কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে। যেমন-

১। যে সন্তান মারা গিয়েছে, তার জন্য মারা যাওয়াই ভাল ছিল এবং তার বেঁচে থাকাটা তার জন্য খারাপ ছিল। এটা পিতা-মাতার জন্য বোধগম্য না হলেও মনে রাখতে হবে আল্লাহ তা’আলা সব কিছু জানেন ও বুঝেন। তিনি সর্বাপেক্ষা হেকমত ওয়ালা।

২। এই সন্তানের কারণে মানুষ কত রকম পেরেশানী ও মুসীবতের সম্মুখীন হয়, সেগুলো চিন্তা করে মনে করব যে, আল্লাহ আমাকে সে সব পেরেশানী থেকে মুক্তি দেয়ার জন্যই হয়ত আমার সন্তানের মৃত্যু ঘটিয়েছেন, কাজেই এটা আমার প্রতি আল্লাহর এক অনুগ্রহ। [১৬৮]সুরা কাহাফ থেকে আমরা এ বিষয়ে শিক্ষা নিতে পারি।

وَ اَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَیْنِ فَخَشِیْنَاۤ اَنْ یُّرْهِقَهُمَا طُغْیَانًا وَّ كُفْرًا ﴿۸۰﴾

'আর বালকটির বিষয় হল, তার পিতা-মাতা ছিল মুমিন। অতঃপর আমি আশংকা করলাম যে, সে সীমালংঘন ও কুফরী দ্বারা তাদেরকে অতিষ্ঠ করে তুলবে'। [১৬৯]

হাদীসে এসেছেঃ যে বালককে খাদির 'আলাইহিস সালাম হত্যা করেছিলেন, সে কাফের হিসেবে লিখা হয়েছিল। যদি বড় হওয়ার সুযোগ পেত তবে পিতা-মাতাকে কুফরী ও সীমালংঘনের মাধ্যমে কষ্ট দিয়ে ছাড়ত। [১৭০]

৩। সন্তানের মৃত্যুর কারণে যে কষ্ট হয় তার বিনিময়ে ছওয়াব অর্জিত হয়। বিশেষ করে নাবালেগ সন্তানের মৃত্যু হলে সে সন্তান পরকালে তার নাজাতের অছীলা হয়ে দাঁড়াবে। সে সন্তান জাহান্নাম আর তার মাঝে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে। এক হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী বড় সন্তানের মৃত্যু হলেও সে কারণে যে কষ্ট হবে তার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা জান্নাত দান করবেন। [১৬৮]

আবূ শা'ছা আস-সান'আনী থেকে বর্ণিত:

তিনি একদা দামেস্কের একটি মাসজিদে গমন করেন এবং এক পর্যায়ে সন্ধ্যায় ভ্রমণ করতে লাগলেন, অতঃপর তার সাথে সাক্ষাৎ হয়ে গেল সাদ্দাদ ইবন আউস ও আস-সুনাবেহী'র। অতঃপর আমি (আবূ শা'ছা আস-সানা'আনী) বললাম: আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহম করুন, তোমরা কোথায় যাওয়ার পরিকল্পনা করেছ? জবাবে তারা বলল: আমরা সেখানে আমাদের এক অসুস্থ ভাইকে দেখতে যাচ্ছি; অতঃপর আমিও তাদের সাথে চললাম, তারপর তারা ঐ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়ে বলল: তোমার সকাল কেমন কেটেছে? জবাবে সে বলল: আমার সকাল নেয়ামতের উপর কেটেছে। অতঃপর তাকে উদ্দেশ্য করে সাদ্দাদ ইবন আউস বললেন: আমি তোমাকে গুনাহ মাফ ও পাপ মোচনের সুসংবাদ দিচ্ছি; কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:

« إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : إِنِّي إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنًا فَحَمِدَنِي عَلَى مَا ابْتَلَيْتُهُ ، فَإِنَّهُ يَقُومُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنْ الْخَطَايَا ، وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : أَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِي وَابْتَلَيْتُهُ ، وَأَجْرُوا لَهُ كَمَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ » . (رواه أحمد) .

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি যখন আমার বান্দাগণের মধ্য থেকে কোনো মুমিন বান্দাকে কোনো বিপদ-মুসিবত দ্বারা পরীক্ষা করি, অতঃপর সে আমার দুঃখ-কষ্টের পরীক্ষা করা অবস্থায় আমার প্রশংসা করে, তখন সে তার শয্যা থেকে ঐ দিনের মত নিষ্পাপ অবস্থায় উঠবে, যেদিন তার মা তাকে নিষ্পাপ অবস্থায় প্রসব করেছে; আর মহান রব বলবেন: আমি আমার বান্দাকে আটক করেছি এবং তাকে দুঃখ-কষ্ট দ্বারা পরীক্ষা করেছি, তোমরা তার জন্য সাওয়াব লিখবে, যেমনিভাবে তোমরা তার সুস্থ অবস্থায় তার জন্য সাওয়াব লিখতে।" [১৭১]

উপসংহারঃ

পরিশেষে বলতে হয় সন্তান এক সম্পদ। নিঃস্ব হলেও সন্তানের আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক মা-বাপের। তাই তো নিঃসন্তান পিতা-মাতা চিকিৎসার্থে কিনা খায়, কোথা না যায়? অবশ্য বৈধভাবে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাহায্য নেওয়া দূষণীয় নয়। দূষণীয় হল সন্তানলোভে কোন পীর-ঠাকুর-মাযারের নিকট গেয়ে নযরাদি মেনে সন্তান-কামনা; বরং এ হল খাঁটি

শির্ক। আল্লাহই যাকে ইচ্ছা সন্তান দেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা রাখেন। কোন পদ্ধতিতে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কারো নিজ ইচ্ছামত পুত্র বা কন্যা জন্ম দেওয়া সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿لِلهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ - أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾

''আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা, তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্রসন্তান দান করেন। অথবা দান করেন পুত্র-কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে বন্ধ্যা রাখেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।'' [১৭২]

পুত্র-কন্যা জন্মদানের ব্যাপারে স্ত্রীরও কোন হাত বা ত্রুটি নেই। তাই কেবল কন্যাসন্তান প্রসব করার ফলে যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়, তারা নিছক মুর্খ বৈ কি? সবই তো আল্লাহর হাতে। পক্ষান্তরে ২/৩টি কন্যা বা বোনের যথার্থ প্রতিপালন করলে পরকালে মহানবী (ﷺ) এর পাশাপাশি বাসস্থান লাভ হবে। [১৭৩]

পরন্তু যে ছেলের আশা করা যায় তা 'ব্যাটা না হয়ে ব্যথা, ল্যাঠা বা কাঁটা'ও তো হতে পারে। তবে সব কিছুই ভাগ্যের ব্যাপার নয় কি? তকদীরে বিশ্বাস ও সন্তুষ্টি এবং আল্লাহর উপর যথার্থ ভরসা থাকলে পরম শান্তি লাভ করা যায় সংসারে। গর্ভের সময় সাধভাত, পাঁচভাজা ইত্যাদির উৎসব ও অনুষ্ঠান বিজাতীয় প্রথা। ইসলামে এসব বৈধ নয়। অনুরূপ পোত পাঠানো ইত্যাদি প্রথাও। দাই ও সাহায্যকারিণী ব্যতীত অন্যান্য মহিলাদের সন্তানভূমিষ্ঠ করা দেখা (গর্ভিণীর গুপ্তাঙ্গ দর্শন) বৈধ নয়। [১৭৪] প্রসূতিগৃহে লোহা, ছেঁড়াজাল, মুড়ো ঝাঁটা প্রভৃতি রাখা শির্ক। বৈধ নয় গর্ভিণীর দেহে তাবীয বাঁধা। প্রসবযন্ত্রণা যতই দীর্ঘ হোক না কেন (খুন না ভাঙ্গলে) নামাযের সময় নামায মাফ নেই। যেভাবে সম্ভব সেইভাবেই নামায পড়তে হবে। (১৭৫]

নবী-রাসুলদের কাছে প্রকৃত ঐশ্বর্য হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম তথা ইসলাম। সাধারণ মানুষ মৃত্যুর সময় সন্তানকে বৃহত্তম ধন-সম্পদ দিয়ে যেতে চায়। আজকাল একজন বিত্তশালী ব্যবসায়ী কামনা করে, তার সন্তান মিলফ্যাক্টরীর মালিক হোক, আমদানী ও রপ্তানীর বড় বড় লাইসেন্স লাভ করুক, লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি টাকার ব্যাংক-ব্যালেন্স গড়ে তুলুক। একজন চাকুরীজীবী চায় তার সন্তান উচ্চপদ ও মোটা বেতনে চাকুরী করুক। অপরদিকে একজন শিল্পপতি মনে-প্রাণে কামনা করে, তার সন্তান শিল্পক্ষেত্রে চুড়ান্ত সাফল্য অর্জন করুক। সে সন্তানকে সারা জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ কলা-কৌশল বলে দিতে চায়। কিন্তু নবীগণ ও তাদের অনুসারী ওলীগণের সর্ববৃহৎ বাসনা থাকে, যে বস্তুকে তারা সত্যিকার চিরস্থায়ী ও অক্ষয় বলে মনে করেন, তা সন্তানরাও পুরোপুরিভাবে লাভ করুক। আর সেটা হচ্ছে দ্বীন ইসলামের উপর অটুট থাকা ও এর একনিষ্ঠ খাদেম হওয়া। এ জন্য তারা দো'আ করেন এবং চেষ্টাও করেন। অন্তিম সময়ে এরই জন্য অসীয়ত করেন। [১৭৬]

নবী-রাসূলগণের এ বিশেষ আচরণের মধ্যে সাধারণ মানুষের জন্যও একটি নির্দেশ রয়েছে। তা এই যে, তারা যেভাবে সন্তানদের লালন-পালন ও পার্থিব আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করে, সেভাবে; বরং তার চাইতেও বেশী তাদের কার্যকলাপ ও চরিত্র সংশোধনের ব্যবস্থা করা দরকার। মন্দ পথ ও মন্দ কার্যকলাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা আবশ্যক। এরই মধ্যে সন্তানদের সত্যিকারের ভালবাসা ও প্রকৃত শুভেচ্ছা নিহিত। এটা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয় যে, সন্তানকে রৌদ্রের তাপ থেকে বাঁচাবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে, কিন্তু চিরস্থায়ী অগ্নি ও আযাবের

কবল থেকে রক্ষা করার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবে না। সন্তানের দেহ থেকে কাটা বের করার জন্য সর্ব প্রযত্নে চেষ্টা করবে, কিন্তু তাকে বন্দুকের গুলি থেকে রক্ষা করবে না। নবীদের কর্মপদ্ধতি থেকে আরও একটি মৌলিক বিষয় জানা যায় যে, সর্বপ্রথম সন্তানদের মঙ্গল চিন্তা করা এবং এরপর অন্যদিকে মনোযোগ দেয়া পিতা-মাতার কর্তব্য।

পিতা-মাতার নিকট থেকে এটাই সন্তানদের প্রাপ্য। এতে দুটি রহস্য নিহিত রয়েছে - প্রথমতঃ প্রাকৃতিক ও দৈহিক সম্পর্কের কারণে পিতা-মাতার উপদেশ সহজে ও দ্রুত গ্রহণ করবে। অতঃপর সংস্কার প্রচেষ্টায় ও সত্য প্রচারে তারা পিতা-মাতার সাহায্যকারী হতে পারবে। দ্বিতীয়তঃ এটাই সত্য প্রচারের সবচাইতে সহজ ও উপযোগী পথ যে, প্রত্যেক পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তি আপন পরিবার-পরিজনের সংশোধনের কাজে মনে-প্রাণে আত্মনিয়োগ করবে। এ পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করেই কুরআন বলেঃ ‘‘হে মুমিনগণ, নিজেকে এবং পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা কর’’। [১৭৭] মহানবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সারা বিশ্বের রাসূল তার হেদায়াত কেয়ামত পর্যন্ত সবার জন্য ব্যাপক। তাকেও সর্বপ্রথম নির্দেশ দেয়া হয়েছেঃ ‘‘নিকট আত্মীয়দেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন।’’ [১৭৮]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারে যখন ইসলাম বিস্তার লাভ করল এবং মক্কা বিজয়ের সময় তা পরিপূর্ণ রূপ লাভ করল, তখন এর প্রতিক্রিয়া কুরআনের ভাষায় এরূপ প্রকাশ পেলঃ ‘‘মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে থাকবে’’। [১৭৯] আজকাল দ্বীনহীনতার যে সয়লাব শুরু হয়েছে, তার বড় কারণ এই যে, পিতা-মাতা দ্বীনের জ্ঞানে জ্ঞানী ও দ্বীনী হলেও সন্তানদের দ্বীনী হওয়ার বিষয়ে চিন্তা করে না। সাধারণভাবে আমাদের দৃষ্টি সন্তানদের পার্থিব ও স্বল্পকালীন আরাম-আয়েশের প্রতিই নিবদ্ধ থাকে এবং আমরা এর ব্যবস্থাপনায়ই ব্যতিব্যস্ত থাকি। অক্ষয় ধন-সম্পদের দিকে মনোযোগ দেই না। আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের সবাইকে তওফীক দিন, যাতে আমরা আখেরাতের চিন্তায় ব্যাপৃত হই এবং নিজের ও সন্তানদের জন্য ঈমান ও নেক আমলকে সর্ববৃহৎ পুঁজি মনে করে তা অর্জনে সচেষ্ট হই। [১৭৬]

সফল গর্ভধারণ ও সুস্থ সন্তান জন্মদানের মাধ্যমে আল্লাহ সকল বাবা-মার অন্তর ও চক্ষু শীতল করুন। আল্লাহ সকল দম্পতিকে চিরসুখী করুন। পরিবার হোক সুখের। পিতা-মাতা হোক আদর্শের। সন্তান হোক বাধ্য। সংখ্যায় শুধু নয়, বরং জ্ঞান-বিজ্ঞান, দ্বীন ও চরিত্রে এক কথায় সর্বকল্যাণে উম্মতের শ্রীবৃদ্ধি হোক।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

তথ্যসুত্রঃ

[১] সুনানে ইবনে মাজাহ, জিহাদ, ৩১৯৪।

[২] মুজামু তাবরানি : ৬৯০৮; মাজমাউজ জাওয়াইদ : ৪/৩০৫

[৩] সূরা আর-রূম, আয়াত: ২১।

[৪] বুখারী ৭৮ কিতাবুল মারদা, ১-বাব…কাফফারাতিল মারদা ৫/২১৩৭

[৫] আহমাদ ৩/১৪৮, ২৩৮,২৫৮।

[৬] আবু দাউদ ২০৪৬, আল নাসাঈ ৩২২৭

[৭] মুসলিম, হাদিস নং- ৩৮৭২

[৮] সুরা বাকারা, ৮৩

[৯] সুরা বাকারা,২১৫

[১০] বুখারী, হাদিস নং- ৫০৪ ও ৬৫২৫; মুসলিম, হাদিস নং- ২৬৪

[১১] বুখারী, হাদিস নং- ২৮৪২; মুসলিম, হাদিস নং- ৬৬৬৮

[১২] আবূ দাউদ, হাদিস নং- ৫১৪৪; আহমাদ, হাদিস নং- ১৬১০৩

[১৩] মুসলিম, হাদিস নং- ৬৬৭৯

[১৪] সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ২৩-২৪

[১৫] সূরা লুকমান, আয়াত: ১৪

[১৬] বুখারী, হাদিস নং- ৫৬২৬; মুসলিম, হাদিস নং- ৬৬৬৪

[১৭] বুখারী, হাদিস নং- ২২৭৭; মুসলিম, হাদিস নং- ৪৫৮০

[১৮] তিরমিযী, হাকিম, বাযযার, তাহাবী, আদ-দুররুল মানসুর

[১৯] বাযযার

[২০] বায়হাকী, কানযুল উম্মাল

[২১] বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ

[২২] হাকিম, তাবারানী, মুসনাদ আবু ইয়ালা

[২৩] মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ

[২৪] Education of Your Baby During Pregnancy, Sheikh Toufiqe Chowdhury

https://www.youtube.com/watch?v=fOkEjHbOeQo

[২৫] সুরা কাহাফ, আয়াত ৮২

[২৬] পরিবার গঠনে ইসলামের গুরুত্ব | আদর্শ মুসলিম পরিবার (hadithbd.com)

[২৭] তিরমিযী, হাদীস নং ১০৮৪

[২৮] সহীহুল বুখারী ১৪১, ৩২৭১, ৩২৮৩, ৫১৬৫, ৬৩৮৮, ৭৩৯৬, মুসলিম ১৪৩, তিরমিযী ১০৯২, আবূ দাউদ ২১৬১, ইবনু মাজাহ ১৯১৯, আহমাদ ১৮৭০, ১৯১১, ২১৭৯, ২৫৫১, ২৫৯২, দারেমী ২২১২

[২৯] সুরা হাজ্জ, আয়াত ৫

[৩০] তাফসীর ইবন কাসীর

[৩১] In the Womb of Your Mother, Mufti Menk

https://www.youtube.com/watch?v=_Kl-5GTxB-Y

[৩২] সূরা আস সাজদাহ, আয়াত ৭–৮

[৩৩] কুরতুবী

[৩৪] সূরা আল-মুমিনুন, ১২

[৩৫] সূরা আস-সাজদাহ, ৮

[৩৬] কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর

[৩৭] ইবনে জরীর, ও ইবনে আবী হাতিম।

[৩৮] ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর

[৩৯] বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, মিশকাত ৮২ নং

[৪০] সুরা আল-আরাফ, আয়াত-১৮৯

[৪১] আবু দাউদ: ৪৮১১, তিরমিযী: ১৯৫৪, মুসনাদে আহমাদ: ২/২৯৫

[৪২] সুরা ইসরা, আয়াত ২৩

[৪৩] সুরা বাকারাহ, আয়াত ২৩৩

[৪৪] সূরা আল-আহকাফ, আয়াত: ১৫–১৬

[৪৫] সুরা ইসরা,আয়াত ২৪

[৪৬] সুরা মারইয়াম, আয়াত ২২

[৪৭] সুরা আন নাযম, আয়াত ৩২

[৪৮] মুজামুল কাবীর লিত তাবরানী: ২/৮১, ৮২ হাদীস নং ১৩৬৮

[৪৯] সুরা আত ত্বলাক্ক, আয়াত ৪

[৫০] সুরা আত ত্বলাক্ক, আয়াত ৬

[৫১] সুরা আলে ইমরান,আয়াত ৩

[৫২] আত-তাফসীরুস সহীহ

[৫৩] সুরা আন-নাহল, আয়াত ৭৮

[৫৪] সুরা আল-মুমিনুন,আয়াত ১২

[৫৫] সুরা আল-মুমিনুন,আয়াত ১৪

[৫৬] সুরা আল ফাতির, আয়াত ১১

[৫৭] সূরা আ'রাফ, ৩৪ আয়াত

[৫৮] সূরা রা'দ,৩৯ আয়াত, ফাতহুল ক্বাদীর

[৫৯] সুরা আয যুমার, আয়াত ৬

[৬০] সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৩১

[৬১] বুখারীঃ ৪৪৭৭

[৬২] তাফসীরে জাকারিয়া

[৬৩] সূরা আনআম, আয়াত ১৫১

[৬৪] বুখারীঃ তাফসীর সূরা বাকারা, আদব অধ্যায়, মুসলিমঃ তাওহীদ অধ্যায়

[৬৫] তাফসীরে আহসানুল বায়ান

[৬৬] সূরা আত-ত্বলাক, আয়াত ৪

[৬৭] আয-যিওয়াজ ৩১-৩৩পৃঃ, রিসালাতুন ফী দিমাইত ত্বাবীইয়্যাতি লিন্নিসা, ৪৪পৃঃ, ফাতাওয়াল মারআহ ৫২,৯৩পৃঃ, লিকাউল বা-বিল মাফতুহ ২৬/১৮,২১

[৬৮] রিসালাতুন ফী দিমাইত ত্বাবীইয়্যাতি লিন্নিসা, ৪৬পৃঃ, তামবীহাতুল মু'মিনাত ৫৩-৫৭পৃঃ

[৬৯] লিকাউল বা-বিল মাফতুহ ২৬/৩৪

[৭০] সহীহ বুখারী, ২১৫৪

[৭১] সুরা ইনশিরাহ, আয়াত ৬

[৭২] সুরা নিসা, আয়াত ৩১

[৭৩] https://ifatwa.info/44884/

[৭৪] সহীহ বুখারী-১১১৭

[৭৫] ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-১/১৩৬

[৭৬] ফাতাওয়ায়ে কাযীখান

[৭৭] বাহরুর রায়েক্ব

[৭৮] সহীহ মুসলিমঃ ৫৭৪

[৭৯] সুরা রাদ : ২৮

[৮০] সূরা মু'মিন-৫৫

[৮১] সূরা ক্বাফ-৩৯

[৮২] সহীহ বুখারী৪০০৮,সহীহ মুসলিম-৮০৭

[৮৩] সহীহুল বুখারী ৬৪০৪, মুসলিম ২৬৯৩, তিরমিযী ৩৫৫৩, তিরমিযী ৩৫৫৩, আহমাদ ২৩০০৫, ২৩০০৭, ২৩০৩৪, ২৩০৫৬, ২৩০৭১

[৮৪] মুসনাদু আহমাদ ৬/৩৪৪

[৮৫] মুসনাদু আহমাদ ৩/১৫২

[৮৬] নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৬/২১০

[৮৭] মুসনাদু আহমাদ ২/১৬৯, নং ৬৫৮৩

[৮৮] সুরা বাকারা : ১৫২

[৮৯] মুসতাদরাক হাকিম ৪/২৭৯

[৯০] ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.), রাহে বেলায়াত, প্রথম অধ্যায় - বেলায়াত ও যিকর

https://www.hadithbd.com/books/link/?id=8740

[৯১] মুসলিম : ৪৮৮৪

[৯২] সহীহ মুসলিমঃ ৫৬৫

[৯৩] সহীহ মুসলিম ১/২০৯, নং ২৩৪, মুসতাদরাক হাকিম ২/৪৩৩, সহীহুত তারগীব ১/১৫৫

[৯৪] সহীহ মুসলিম ১/২৮৮, নং ৩৮৪

[৯৫] শরহে সহিহ বুখারি, ইবন বাত্তাল : ৪৬ পৃ.

[৯৬] https://www.daily-bangladesh.com/lifestyle/21266

[৯৭] মুসনাদে আহমাদ আল-মাকতাবাতুশ-শামেলা. হা/ ২২৯৭১

[৯৮] আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ প্রমুখ, সহীহুল জা'মে হা/৭৭৪৩

[৯৯] বুখারী ৬৩০৭

[১০০] বুখারী ৭৮০৫ , মুসলিম ৭১২৮

[১০১] ইমাম ইবনু রজব, মাগফিরাতের পথ ও পাথেয়

[১০২] ইমাম বুখারি, আস-সহিহ: ৬৩০৬

[১০৩] মুসলিম ৩৮৪

[১০৪] আল-ফাররা, আবু যাকারিয়া ইয়াহ বিন যিয়াদ, মায়ানীল কুরআন ১/৪৫১, তাবারী, তাফসীর ১১/১৬-১৮, ইবনে কাসীর, ইসমাঈল তাফসীর ২/৩৬৯

[১০৫] সূরা তাওবা, আয়াত ১০৩

[১০৬] তাবারী, তাফসীর ২২/৪৩, ইবনে কাসীর, তাফসীর ৩/৪৮৬-৪৮৭

[১০৭] সূরা আহযাব, আয়াত ৫৬

[১০৮] মাজমু‘উল ফাতওয়া: ৩৯৬/১১

[১০৯] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭২০

[১১০] তাখরীজ কুতুবুত সিত্তাহ: তিরমিযী ২৬৭৭

[১১১] সুরা মারইয়াম, আয়াত ২৫

[১১২] সুরা নামল, আয়াত ৬২

[১১৩] সুরা আলে ইমরান, আয়াত ৩৮

[১১৪] সুরা সাফফাত, আয়াত ১০০

[১১৫] সূরা আল-ফুরকান, আয়াত ৭৪

[১১৬] সূরা ইবরাহীম, আয়াত ৩৯-৪১

[১১৭] সুরা আম্বিয়া, আয়াত ৮৯

[১১৮] https://muslimbangla.com/masail/24804

[১১৯] সুনানুত তিরমিযী ৪/৬৬৭, নং ২৫১৬, মুসতাদরাক হাকিম ৩/৬২৩, ৬২৪)

[১২০] সুনানুত তিরমিযী, কিতাবুয যুহদ, নং ২৩২৬

[১২১] সুনানে তিরমিযী, কিতাবুত দাওয়াত, নং ৩৯৭৩

[১২২] আবু ইয়ালা মাওলিসী, আল-মুসনাদ ৮/৪৪-৪৫, নং ৪৫৬০, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১৫০

[১২৩] সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৪৬

[১২৪] মুসলিম: ২২৩

[১২৫] সূরা আল-হজ, আয়াত ১১

[১২৬] সূরা নাবা: ৯

[১২৭] তাবরানি

[১২৮] সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৬১

[১২৯] সূরা আদ-দাহর, আয়াত: ৮

[১৩০] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৯৫৯।

[১৩১] সহীহুল জামে‘, হাদীস নং ৪৫১০।

[১৩২] সিলসিলাহ সহীহাহ: খণ্ড ৭।

[১৩৩] সহিহুল জামি: হাদীস নং ৫১৩৬।

[১৩৪] সহীহ মুসলিম ২২২১

[১৩৫] সহীহ মুসলিমঃ ২৫০

[১৩৬] সুরা হুদঃ আয়াত ১১৪

[১৩৭] সূরা ত্বা-হাঃ ১৩২

[১৩৮] তিরমিযী, সহীহুল জা'মে হা/৬৪৬৯

[১৩৯] মুসলিম আল-মাকতাবাতুশ-শামেলা হা/৭৯৮

[১৪০] তিরমিযী, সহীহুল জামে ৮০৩০

[১৪১] আবু দাউদ নাসাঈ, তিরমিযী, সহীহুল জামে ৮১২২

[১৪২] সুরা ত্ব-হা ১১৪ আয়াত

[১৪৩] সুরা যুমার ৯ আয়াত

[১৪৪] সুরা মুজাদালা, আয়াত ১১

[১৪৫] সুরা ফাত্বের, আয়াত ২৮

[১৪৬] সহীহুল বুখারী ৭১, ৩১১৬, ৩৬৪১, ৭৩১২, ৭৪৬০, মুসলিম ১০৩৭

[১৪৭] মুসলিম ২৬৯৯, ২৭০০

[১৪৮] তিরমিযী হাসান ২৬৮৫

[১৪৯] সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৯

[১৫০] আল-ইনসাফ, ৭/৩৮২

[১৫১] ফাতাওয়া আল-সিয়াম, পৃষ্ঠা- ১৬১-১৬২

[১৫২] মাজমুউল ফাতাওয়া ১৫/২২৪

[১৫৩] সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১৪৬

[১৫৪] সুরা আয-যুমার, আয়াত ১০

[১৫৫] সুরা বাকারাহঃ আয়াত ১৫৫-১৫৭

[১৫৬] মুসনাদে আহমাদ: ৬/৩৬৯

[১৫৭] সুরা আসর

[১৫৮] মাদারেজুস সালেকীন। ২/১৫৬

[১৫৯] মুসলিম: ২৯৯৯

[১৬০] মুসলিম ৯১৮

[১৬১] সহীহ। ইবন মাজাহ ১৬০৩, সহীহ আল জামে' ৫৭৮০

[১৬২] সুনান আবু দাউদ ২৫২১

[১৬৩] সুরা তুরঃ ২১

[১৬৪] সহীহ ইবনে মাজাহ ১৩০৫নং

[১৬৫] সিঃ সহীহাহ ৪৩২নং

[১৬৬] বুখারী ১০ ১ নং, মুসলিম ২৬৩৩ নং

[১৬৭] দঃ ফাতহুল বারী ৩/২৪৫

[১৬৮] মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, আহকামে যিন্দেগী , ৪র্থ সংস্করণ, মাকতাবাতুল আবরার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

[১৬৯] সুরা কাহাফ, আয়াত ৮০

[১৭০] মুসলিমঃ ২৬৬১

[১৭১] আহমাদ

[১৭২] সূরা আশ-শূরা, আয়াত ৪৯-৫০

[১৭৩] আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ ২৯৬ নং

[১৭৪] মুসলিম ৩৩৮নং

[১৭৫] ফাতাওয়াল মারআহ ৩৫পৃঃ

[১৭৬] তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন

[১৭৭] সূরা আত-তাহরীম, আয়াত ৬

[১৭৮] সূরা আশ-শু'আরা, আয়াত ২১৪

[১৭৯] সূরা আন-নসর, আয়াত ২

[১৮০] https://islamqa.info/en/answers/161204/the-virtues-of-pregnancy

[১৮১] Fiqh of Pregnancy 1 Sheikh Dr. Omar Suleiman
https://www.youtube.com/watch?v=zrr3BlINrP8

[১৮২]https://m.facebook.com/Iqra.Deen/photos/sunnah-ofpregnancyhaving-children-is-one-of-the-blessings-of-allah-god-provides/1536481983035483/

[১৮৩] (ক) পিতামাতার সাথে আদব: | কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মুসলিম জীবনের আদব-কায়দা (hadithbd.com)

[১৮৪] পরিবার গঠনে ইসলামের গুরুত্ব | আদর্শ মুসলিম পরিবার (hadithbd.com)

[১৮৫] https://nikah.com/marriage/virtues_of_pregnancy.asp

[১৮৬] https://www.jagonews24.com/religion/article/364960

[১৮৭]https://quranerjyoti.com/%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%AC%E0%A6%A4%E0%A7%80-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%B2-%E0%A6%93-%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE/

[১৮৮] Productive Pregnancy - Understand Al-Qur'an Academy (understandquran.com)

[১৮৯] Surah Al Kauthar Tafsir By Nouman Ali Khan (nakcollection.com)

[১৯০] (3) Family Planning in Islam Dr Zakir Naik | birth control in islam | the straight path - YouTube

পরিশিষ্ট

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে যিনি আমাকে এই কাজ সম্পন্ন করার তৌফিক দিয়েছেন। তাঁর মহান রাসুলের উপর দরুদ ও সালাম। **IOM** এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ, বিগত তিনটি বছর ধরে সকল রকম সহযোগিতার জন্য। মুফতি আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদকে অনেক ধন্যবাদ, তিনি আমাদের উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং সহযোগিতা করেছেন লেখার জন্য। **IOM** এর সকল উস্তাদদের আন্তরিক ধন্যবাদ। তাঁদের হক আমরা আদায় করতে পারিনি। কিন্তু তাঁরা সবসময় আমাদের দুয়ায় থাকবেন ইনশাআল্লাহ। মহান রব্বুল আলামীন তাঁদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বোত্তম পুরস্কার দান করুন। সীমিত সময়ের মধ্যে লেখা এই ছোট গবেষণা পত্রে প্রচুর ভুল ত্রুটি রয়ে গেছে। মহান আল্লাহর দরবারে সকাতর প্রার্থনা, তিনি ভুল ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দিন এবং দ্বীনের পথে আমার এই ক্ষুদ্র চেষ্টা তিনি কবুল করে আমার, আমার পরিবারের, আমার পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলিমের নাজাতের অসীলা বানিয়ে দেন। আমীন!

নুসরাত জাহান

ব্রিসবেন, কুইন্সল্যান্ড

অস্ট্রেলিয়া

Full Address:

Nusrat Jahan

57 Mount Gravatt East

Brisbane, Queensland

Australia

Ph. No. +61470508841

IOM Batch: 201

IOM ID: 20102089